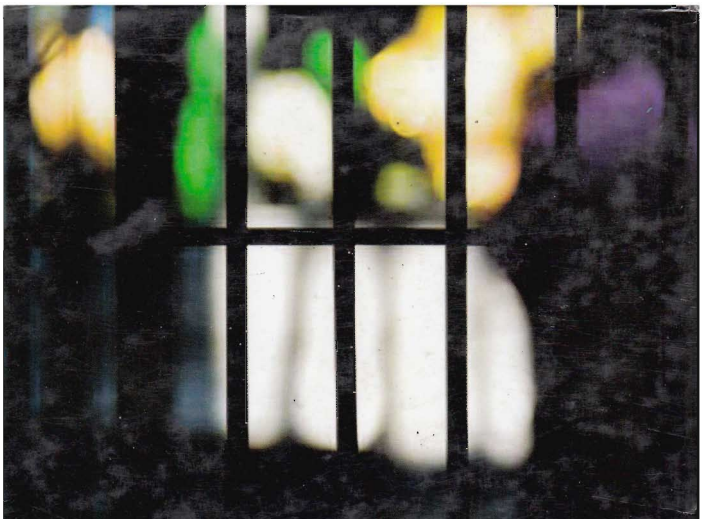

উম্মে মুসলিমা

আলো আছে আলো নেই

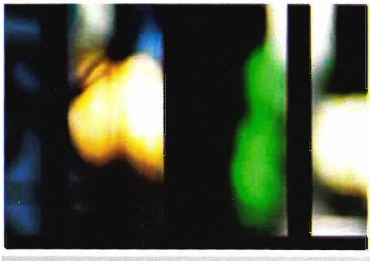

সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ধারাতেই সমান পদচারণায় উম্মে মুসলিমার সরব উপস্থিতি থাকলেও ইদানিং ছোটগল্প লেখায় সময় দিচ্ছেন বেশি। কবিতার চেয়ে ছোটগল্প লেখা অধিক অশ্রমসাধ্য বলে তার মনে হয়। যদিও একটি সার্থক ছোটগল্প একটি দীর্ঘ কবিতা হয়ে ওঠে কারো কারো লেখার গুণে। কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, ছড়া সবগুলোতেই তিনি স্বচ্ছন্দ। এর আগে ২০০৮ সালে তার দুটি ছোটগল্পগ্রন্থ বেরিয়েছে। তার গল্পের মূলসুর উঠে আসে মূলত তার শৈশব কৈশোরের স্মৃতিময় গ্রাম ও মফস্বল জীবন থেকে। এছাড়াও মানবমনের বিচিত্র দিক যা সচরাচর গোচরীভূত নয়, সেগুলোকে কৌশলে পরিস্ফূটনের সাহস দেখিয়ে চলেছেন। আর নারীর প্রতি স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্বে নারীর বঞ্চনার কথাতো রয়েছেই। গল্পগুলোর প্রায় প্রতিটিই দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিকসমূহের সাহিত্য সাময়িকীতে গত দু'বছরে প্রকাশিত। বড় কাজ অর্থাৎ উপন্যাস রচনায় হাত দেয়ার জন্য বন্ধু-গুভানুধ্যায়ীদের ক্রমাগত অনুরোধে বাধ্য হয়ে দুঃসাহস দেখাতে শুরু করবেন বলে ভাবছেন। যারা তার ছোটগল্পের মুগ্ধ পাঠক তাদের আগ্রহকে মাথায় রেখে কাজ করে যেতে চান উম্মে মুসলিমা– যদিও আলসেমি তার অতি প্রিয় বিষয়।

সূচীপত্র

ISBN 984-70022-0192-6

উম্মে মুসলিমা কবি ও কথাসাহিত্যিক। জন্ম: চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর গ্রাম। পড়াশোনা: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। লেখালেখি: আশির দশক। চাকরি: প্রকল্প পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা। সন্তান: ২জন।

ইমেল: lima_umme@yahoo.com

প্রচ্ছদ

মেহেদী হাসান

আলো আছে আলো নেই

আলো আছে আলো নেই

উম্মে মুসলিমা

সূচীপত্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক ◻ সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ◻ ৭১১৩৮৭১

আলো আছে আলো নেই
উম্মে মুসলিমা

স্বত্ব ◻ গ্রন্থকার
প্রথম প্রকাশ ◻ ফেব্রুয়ারি ২০১১
প্রচ্ছদ ◻ মেহেদী হাসান
বর্ণবিন্যাস ◻ রেজোয়ানা জামান
মুদ্রণ ◻ মৌমিতা প্রিন্টার্স, প্যারিদাস রোড, ঢাকা ১১০০

ভারতে পরিবেশক ◻ রাজু বুক স্টোর
স্টল নং ৭, ব্লক-২, কলেজ স্কয়ার (দক্ষিণ)
সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা, ভারত
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশক ◻ মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক
www.muktadhara.com
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক ◻ সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
কানাডায় পরিবেশক ◻ এটিএন বুক এন্ড ক্রাফট্স
২৯৭০ ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ, টরেন্টো

Aalo Aache Aalo Nei
by Umme Muslima

Published by Saeed Bari, *Chief Executive*, Sucheepatra
38/2Ka Banglabazar Dhaka 1100. Bangladesh
Ph : (880-2) 7113871
e-mail : sucheepatra77@gmail.com, saeedbari07@gmail.com
website : www.sucheepatra.com

Price : BDT. 150.00 Only US $ 7.00

মূল্য : ৳ ১৫০.০০ মাত্র

ISBN 984-70022-0192-6

এই বইয়ের বিষয়বস্তু লেখকের নিজস্ব, লেখকের মতামতের জন্যে প্রকাশক দায়ী নন—প্রকাশক

উৎসর্গ

আমার প্রাণের বন্ধু
মলি আর মল্লিকা

সূচিপত্র

বাঁচা	৯
স্মরণবিলাস	১৪
স্বখাত সলিল	১৯
পরম্পরা	২৬
রাজধানীর রাত	৩২
সেবিকা	৩৮
বোকা আইজেল	৪৩
বৈঁচি বালিকা	৪৮
নেপথ্যে	৫৩
অষ্টমপ্রহর	৫৭
আলো আছে আলো নেই	৬২
অপাত্য যৌবনে	৬৮
বিপ্লুত বেহাগ	৭৫
কবি কবিতা এসএমএস...	৮১

বাঁচা

ফরিদা চিনেমাটির থালাবাটি ভাঙতো, টিভি দেখতে বসে ভাত পুড়িয়ে ফেলতো, সাবানে কাপড় মাখিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ফেলে রেখে দিয়ে এ কাপড়ের রঙ ও কাপড়ে লাগিয়ে কাপড়ের বারোটা বাজিয়ে দিত। আমার দামি লিপস্টিক নিজের ঠোঁটে লাগাতে গিয়ে ভেঙে ফেলতো। আমি ব্যবহার করতে গিয়ে তা আবিষ্কার করে জিজ্ঞাসা করলে টাটকা মিথ্যে 'আমি ভাঙছি না তো' বলতে ওর এক সেকেন্ডও লাগতো না। ও আমার অনেক ক্ষতি করলেও কোনদিন সুঁইটুকুও চুরি করেনি। দোষের মধ্যে একটাই টিভিতে বাঙলা সিনেমা তাকে দেখতে দিতে হবে। আমার স্বামী জানপ্রাণ ঢেলে পুরোন খেলা দেখেন, মেয়ে 'ফ্রেন্ডস' দেখার সময় কাউকে অ্যালাও করে না। আর আমি টক শো দেখার জন্যে ভাতের প্লেট নিয়ে সোফায় জম্পেশ বসে পড়ি। বেচারা ফরিদা বাঙলা সিনেমা না দেখতে পেয়ে রান্নাঘরে বসে বসে কাঁদে। আমি আমার আত্মভোলা স্বামীর কাছে মাঝেমাঝে বায়না ধরি বাঙলা সিনেমা দেখবো বলে। ও বলে–

'তোমার আবার এতো অধঃপতন কবে হলো'

'বারে, দেখতে হবে না বাঙলা সিনেমার কতোখানি উত্তরণ হলো?' আসলে তো আমি ফরিদার জন্যে এসব ধানাই পানাই করি। শুক্রবার বিকেলে আমার মেয়ের গানের ক্লাস আর স্বামীর টুর-ফুর থাকলে আমি ফরিদাকে পুরোপুরি টিভি ছেড়ে দিতাম। ও মনের সুখে সিনেমার নায়িকার দুঃখে কেঁদেকেটে একাকার করতো। একবার আমার স্বামীর অফিসের পিকনিকে র‍্যাফেল ড্র হলো। আমরা দুটো টিকেট কিনেছিলাম। আমি খুব মনে মনে চাচ্ছিলাম 'হে আল্লাহ, প্রথম পুরস্কার চৌদ্দ ইঞ্চি রঙিন টিভিটা যেন আমরা পাই। তাহলে ওটা ফরিদার বাঙলা সিনেমা দেখার জন্যে পুরোপুরি ছেড়ে দেব'। কুড়িটা পুরস্কারের মধ্যে একাদশতম পুরস্কার একটা ইস্ত্রি পেয়েছিলাম। যেটার আসলেই কোন দরকার ছিল না। কারণ ওটা আমাদের একটা আগেই ছিল।

ফরিদার চেহারাটা ছিল ভারি মিস্টি । ও যেদিন যে নায়িকার সিনেমা দেখত সেদিন সে নায়িকার মতো ভঙ্গি করে কথা বলতো। একবার আমার মামাতো বোন এলো কানাডা থেকে। ওর চুল ছোট করে কাটা। খুবই সুন্দর দেখতে। ও ফিরে যাওয়ার পরদিন বাথরুমের বেসিনের উপরে নিচে অনেক কাটা চুল পড়ে থাকতে দেখলাম। এখানে কে চুল ছাঁটলো? রান্নাঘরে গিয়ে দেখি ফরিদা নিজের চুল টেনে টেনে রাবার দিয়ে বাঁধার চেষ্টা করছে। কিন্তু এতো ছোট করে ফেলেছে যে রাবারে আটকাচ্ছে না। আমার মামাতো বোনকে দেখে ওর খুব পছন্দ হয়েছে। ওর মতো হতে চায়।

'কী সর্বনাশ, অতো বড় চুল একা একা কী করে কাটলি?'

'আমি কাটছি না তো' মুখের ওপর জলজ্যান্ত মিথ্যে বলতে ওর জুড়ি নেই।

'আর একবছর পর তোর বাপ এসে তোকে বিয়ে দিতে নিয়ে যাবে। গ্রামের মেয়েদের বড় চুল না থাকলে কেউ সুন্দরী বলে না'

'আমি বিয়া করলে সেন?'

আমার কাজিনও কানাডা ফিরে যাওয়ার সময় ফরিদাকে ওর ব্যবহৃত প্রসাধনী সামগ্রীর বেশ কয়েকটা দিয়ে গেল। ওর বাচ্চা দুটোকে ফরিদা খুব যত্নে রেখেছিল। ফরিদার বহুল উচ্চারিত একটি শব্দের ব্যবহারে বাচ্চাগুলোও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ফরিদাকে ডাকলেই ফরিদা উত্তর দিত 'কোনচেন'। অর্থাৎ 'বলেন' বা 'আসছি' গোছের। ওদের মা ওদের ডাকলে ওরা প্রথম প্রথম ফরিদাকে অনুসরণ করে জবাব দিত–'ইয়েস মামা, কোয়েশ্চেন'। পরের দিকে অবশ্য ঠিক উচ্চারণেই বলতে শুরু করেছিল 'আ'ম প্লেইং মামা, আই ক্যান নট কোনচেন'।

বছরখানেক বাদে ফরিদার বাপ এলো ফরিদাকে নিয়ে যেতে। ও যত না কাঁদে আমি বাথরুম বন্ধ করে ট্যাপে পানি ছেড়ে ওর চেয়ে বেশি কাঁদি। শেষপর্যন্ত সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা আর একটা টাঙ্গাইল সিল্ক শাড়ি ওর বাবার হতে দিয়ে ওকে বিদায় করা হলো। যেটা কেউ জানলো না তা হলো আমার বিয়েতে উপহার হিসেবে পাওয়া একটা চাষাড়ে ডিজাইনের কানের দুল আমি লুকিয়ে ওকে দিয়ে দিলাম। আমার স্বামী জীবনেও ওসবের খোঁজ নিতে যাবে না তা জানতাম। কেননা আমি চারশো টাকার শাড়ি পরে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালে সে বলে এতো দামী শাড়ি ঘরে পরে আছ কেন? আবার কোন বিয়ের অনুষ্ঠানে কাতান পরে গেলে বলে–'বিয়ের আসরে এতো কমদামী শাড়ি পরে যাচ্ছ?' ইমিটেশন পরলে বলে–ওসব খুলে রেখে বাইরে যাও। যা ছিনতাই বেড়েছে! সোনার গয়না পরলে বলে–তোমার রুচি নেই! এসব কী পরেছ!

দু'মাস পর ফরিদার চিঠি এলো। আমারই দেয়া একটা পুরোন ডায়েরির পাতা ছিঁড়ে লিখেছে–

শদ্রেয় কালাম্মা,

আমার ছালাম নিবেন। পর সুমাচার এই যে আফনার জামায় ঢাকাই টেসকি চালাই। আমার শাসোরি কানফুল দুইডা ননদেরে দিতে চাই। আমি বলেছি এইডা আমার মায়ের আর্শিভাদ সৃতি। আমি কেউরে দিব না। আফনার ঝামাই বালো। আফনাকে দেখার জন্য পরান পুরে। কালোকে আমার সালাম দিবেন। ভুনকে মাপ করিতে বলবেন। আমি তখন তারার একটা ফুলদানি বেঙে ফেলেছি আর ভুন কেদেছে আর আমি দুখু পেয়েছি। ইতি। আফনার ফরিদা।

এর পর ফরিদার সাথে আর যোগাযোগ নেই প্রায় পাঁচ ছ বছর। মাঝে মাঝে যে ওর কথা মনে হয় না তা নয়। ওর চিঠির একটা উত্তর দেব দেব করেও এ পাঁচ বছরে হয়ে উঠলো না। নিশ্চয় ফরিদা এতোদিনে বাচ্চার মা হয়েছে। লেখাপড়া জানা বউদের স্বামীরা বেশ দাম দেয়। ফরিদাতো ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছিল। তাছাড়া ফরিদা তো দেখতেও সুন্দরী। ভালো সাজগোজও করতে পারতো। ভালোই তো থাকার কথা

মেয়েটার। তবুও কোন অলস দুপুরে একটু পান খেতে ইচ্ছে হলে মনে হয় ইস্ ফরিদাটা থাকলে একদৌড়ে গলির মোড় থেকে পান নিয়ে আসতো। একবার আমি আর আমার মামাতো বোন দুপুরে পোলাও টোলাও খেয়ে পানের জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম। ফরিদাকে পয়সা দিয়ে বললাম–'দৌড়ে যাবি আর আসবি'। ফরিদা নিমেষে পানের খিলি নিয়ে হাজির। একটু পর বারান্দার জানালা দিয়ে পানের পিক্ ফেলতে গিয়ে দেখি হাঁটুর নিচে প্রায় তিন ইঞ্চি থেঁতলে যাওয়া জায়গায় ফরিদা ডেটলে টিসু ভিজিয়ে চেপে চেপে লাগাচ্ছে। পান নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উঠতে গিয়ে এ হাল। এমনই পাগলী। অসুধ লাগিয়ে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা দিয়ে ওর পা বেঁধে দিতে দিতে বললাম–

'তাড়াতাড়ি আনতে বলেছি বলে কি নিজেকে জখম করে আনতে হবে? কোথায় পড়ে গিয়েছিলি?'

ফরিদার যথারীতি উত্তর–'আমি পড়ছি না তো'।

এরকমই এক দুপুরে দরজায় খুট খুট করে শব্দ হচ্ছে। পরিচিত কেউ হলে বেল দেয়। মাঝে মাঝে বাচ্চা টোকাইরা এসে এটা ওটা চায়। বাড়তি খাবার থাকলে দিই। না হলে বিছানা থেকে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। ওরা দরজা খুট খুট করে বিরক্ত হয়ে খানিক পরে চলে যায়। খুট খুট শব্দটা এতো আস্তে আর কেমন যেন তালের সাথে হচ্ছিল যে একটা সুরের মতো ভেসে আসছিল। সমারসেট মম-এর 'মাদার ইন ম্যানভিল' গল্পের ছোট্ট জেরির কাঠ কাটার শব্দের মতো বিরামহীন অথচ বিরক্তিহীন সেই সুরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙলো ঘন্টা দুয়েক পর। তখনও সেই খুট খুট শব্দ। সাথে একটা বাচ্চার গলা নামিয়ে কান্না। আর দেরী না করে দরজা খুলতেই দেখি এক মহিলা এক সন্তান কোলে আর একটাকে পাশে বসিয়ে মুখ নিচু করে শাড়ির আঁচল খুঁটছে। কে ও? ময়লা শাড়ি, হাড্ডিসার শরীর, লাবন্যহীন মুখাবয়ব। ফরিদা! কয়েক মুহূর্ত স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে ওর হাত ধরে বাসার মধ্যে নিয়ে এলাম। আঠারো-ঊনিশ বছর বয়সের কিশোরী মা ঘরে ঢুকে মেঝেতে বসে নির্দ্বিধায় আমার সামনে ব্লাউজের বোতাম খুলে সন্তানের মুখে শুকনো শিথিল স্তন তুলে দিল। সেই ফরিদা। আমার মেয়ে বলতো মা দেখ, ওকে সমাপ্তির অপর্ণা সেনের মতো দেখতে লাগে। ফরিদার একটা পানি খাওয়ার গ্লাস ছিল। আমি ওটা রেখে দিয়েছিলাম। ভাত খাওয়ার পর সেটাতে পানি দিলে পরিচিত গ্লাসটা হাতে নিয়ে ফরিদা সেই প্রথম হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। ও কেন কাঁদলো সেটা ব্যক্ত করার ভাষা ওর জানা না থাকলেও আমি বুঝলাম ওকে স্মৃতির মেঘ ভিজিয়ে দিচ্ছে। ওর বুক ভেঙে অবিরাম নামছে ফেলে আসা দিনের জলপ্রপাত।

ফরিদার দুটো মেয়ে। বড়টি তিন বছরের আর কোলেরটা তিন মাসের। স্বামীর সাথে কচুক্ষেত বস্তিতে দেখা করে এসেছে। স্বামী আগেই বলেছিল এবার মেয়ে হলে সে ফরিদাকে তালাক দেবে। বড় মেয়েটা বাবার দেখা পেয়ে 'আব্বা' 'আব্বা' বলে কোলে উঠতে যায়। ঘরের মধ্যে থেকে মাঝবয়েসি এক মহিলা বেরিয়ে এসে ফরিদার চুলের মুঠি ধরে বাচ্চাদেরসহ বের করে দেয়। ফরিদা বড় মেয়েটাকে রেখে আসতে

চেয়েছিল। এতোগুলো পেট ও একা চালাবে কী করে? কিন্তু স্বামীর নতুন বউ-এর মূর্তি দেখে সে সাহস হয়নি।

'তাহলে এখন কী করবি? এতোগুলো বাচ্চা নিয়ে কারো বাসায় কাজওতো পাবি না।'

'মেয়েডা এট্টু বড় হলে আফনার বাসাত দিতাম পারতাম। কিন্তু সমেস্যা তো আরও আছে'–বলে ফরিদা কোলের মধ্যে থেকে ছোট মেয়েটাকে দুহাতে উঁচু করে তুলে ধরলো। মেয়েটার দুটো পায়ের পাতা বাঁকা। চমকে উঠলাম। অসহায় ফরিদার কোলে ততোধিক অসহায় মেয়েশিশু। এরা কোথায় যাবে? কে দেবে এদের বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা? আমি আর কদিন রাখতে পারবো এদের আমার বাসায়?

'সরকারি হাসপাতালে লইছিলাম। অপরেশোন করলে ভালো হইবো কইছে। ট্যাকা লাগবো অনেক। আমরারে কে দিব ট্যাকা?'

আমার কাজিন যার ছোট চুল দেখে ফরিদা নিজে চুল কেটেছিল তার কিছু টাকা ছিল আমার কাছে। ফোন করে ওকে বলতেই ও ফরিদাকে চার হাজার টাকা দিয়ে দিতে বললো। আমার নিজের কাছ থেকে আরও একহাজার। আমার মেয়ে পঙ্গু বাচ্চাটাকে দেখে আড়ালে চোখ মুছলো। আমার স্বামী তার ডাক্তার বন্ধুকে টেলিফোনে বাচ্চাটার অপারেশনের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলো। ফরিদা নিজের বাচ্চা দুটোর নামও রেখেছে আমার ঐ কাজিনের মেয়ে দুটোর নামে। ও বড় মেয়েটার কোলে ছোটটিকে বসিয়ে রেখে আমার ঘর মুছে দিল। পুরোনো হাড়ি কড়াই মেজে ঝকঝকে করে দিল। আমার মেয়ের বইয়ের আলমারি গুছিয়ে দিল। আমার ব্লাউজের আলগা হুক নতুন করে সুই সুতো দিয়ে এঁটে দিল। কিন্তু কাজ করতে করতে কোন গান গাইলো না। যে ফরিদা সারাক্ষণ গান গাওয়ার জন্যে আমার মেয়ের কাছে বকা খেত সে কিছু জিজ্ঞাসা ছাড়া নিজে থেকে একটাও কথা বললো না। একবার শুধু 'বিদ্যাশের হেই কালাম্মায় কেমুন আছে?' নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করলো। যে দুদিন ফরিদা থাকলো আমার বাসায় আমি টিভিতে বাংলা সিনেমা শুরু হলে ওকে ডেকে বসাতাম। ও বাচ্চা কোলে নিয়ে আগের সেই একই ভঙ্গীতে মাথার পেছনে হাত দিয়ে এক হাঁটু ভেঙে দেয়ালে মাথা দিয়ে বসতো। কিন্তু ঘুমাতো। ওর বড় মেয়েটা খুব খুশি হয়ে টিভির একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে সিনেমা দেখতো। ফরিদা যাওয়ার দিন বলে গেল পলাশীতে ওর এক চাচী থাকে তার কাছে গিয়ে উঠবে। কাছেই মেডিকেল হাসপাতাল। ওখানে থেকেই মেয়ের পায়ের অপারেশনটা করিয়ে নেবে। একহাতে বড়মেয়ের হাত ধরে ছোটটাকে বুকে নিয়ে ফরিদা বেরিয়ে গেল। জানালা দিয়ে যদ্দুর দেখা যায় ফরিদাকে দেখতে থাকলাম। সেই ফরিদা। কতো আর বয়স হবে? টিন এজও শেষ হয়নি ওর। আমার মেয়ের চেয়ে ছোটই তো। দুটো মেয়ের পুরো দায়িত্ব ওর একার কাঁধে। কী সাজাটাই না সাজতো! আর এখন ওর ঢিলে ব্লাউজের নিচ থেকে ততোধিক ঢিলা স্তন দেখা যায়। দূর থেকে দেখলাম হাঁটতে গিয়ে একবার স্পঞ্জের স্যান্ডেলের ফিতার বল্টুটা বেরিয়ে গেলে রাস্তার ওপর বসে সেটা ঠিকঠাক ঢুকিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলো। পেছন ফিরে একবার তাকালো। কোমর থেকে নেমে যাওয়া শাড়ি টেনে তুলে দিল। আঁচলের খুঁট দিয়ে ফরিদা ওর চোখ মুছলো কি না জানিনা আমি বিছানায় এসে নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। মনে পড়লো

ঘর মোছার সময় ফরিদা গান গাইতো 'তোমায় দেখলে মনে হয়, হাজার বছর তোমার সাথে ছিল পরিচয়, বন্ধু ছিল পরিচয়'।

মাঝে মাঝেই ফরিদার কথা মনে হয়। ওকে আমার মোবাইল নাম্বারটাও দিয়েছিলাম। বলেছিলাম মেয়ের অপারেশনের সময় কোন দোকান-টোকান থেকে কল দিস। পারলে যাব। ও করেনি। আমার স্বামীও দুদিন জিজ্ঞাসা করেছে–

'ফরিদার মেয়েটার অপারেশন কেমন হলো তাতো জানাও গেল না। হয়েও তো গেল প্রায় এক বছরের বেশি'

'দুই বছর তিন মাস'–আমি বললাম। 'তোমার সেই ডাক্তার বন্ধুটাওতো তোমার বলার পরপরই বদলী হয়ে গিয়েছিল। কোথায় কীভাবে যে মেয়েটার অপারেশন হলো আল্লাই জানে।'

এর কিছুদিন পর আমার মেয়েকে ওর কোচিং সেন্টার থেকে আনতে বেরিয়েছি। 'আনন্দ' সিনেমা হলের কাছে যানজটে গাড়ি আটকে গেলে দুটো টোকাইকে পয়সা দিতেই একপাল ভিক্ষুক গাড়ি ঘিরে ধরলো। আমি জানালার কাঁচ উঠিয়ে দিতেই ওরা কিছুক্ষণ ঘ্যানর ঘ্যানর করে হতাশ হয়ে অন্য গাড়িতে লাইন দিল। জানালা ফাঁকা হতেই কাঁচ নামিয়ে দেখতে পেলাম সিনেমা হলের পাশে ওভার ব্রিজের গোড়ায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসা খুব পরিচিত ভঙ্গীর কোন এক নারীকে। কে যেন এরকম ভঙ্গীতে বসে থাকতো? মহিলাটির দিকে তাকিয়ে ভঙ্গীটা বিস্মরণের রিসাইকেল বিন থেকে দ্রুত খুঁজতে চেষ্টা করলাম। সে আমাকে লক্ষ ক'রে, না এমনিতেই মাথার ঘোমটা আরো খানিকটা টেনে নামিয়ে দিল বুঝলাম না। ঘোমটার মধ্যে থেকে মুখটা দেখা যাচ্ছে না। সামনে একটা বিছানো চটের ওপর শুয়ে আছে দু'পা বাঁকা বিকলাঙ্গ একটি শিশু। শিশুটি মেয়ে না ছেলে দূর থেকে ঠাহর করতে পারলাম না। চটের ওপর শিশুটির পায়ের কাছে অনেক রেজগি। পাশ দিয়ে যারা যাচ্ছে অনেকেই দু'এক টাকা করে ফেলছে। আমি নামবো ভেবে গাড়ির লক উঠিয়ে দরজা খোলার আগেই যানজট যেন ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে গেল। আমার গাড়ির ড্রাইভার সে সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

'সুখে থাকতে ভুতে কিলায়–বলে একটা কথা আছে না? তোর হয়েছে তাই। এসব দুঃখবিলাসের কোন মানে হয় না। পেতিস আমার স্বামীর মতো একটা হাড় বজ্জাত। উঠতে বসতে গঞ্জনা। বুঝতিস ঠেলা। পেয়েছিস তো একটা ভালোমানুষ। চরিয়ে খেলি!' মিতুর কথা অবশ্য একদিকে ঠিকই। রিনির স্বামী সত্যিকারের ভদ্রলোক। মিতু চাকরি করে বলে ওর স্বামী ওকে সন্দেহ করে। অফিস থেকে ফিরতে দেরি হলে হাজারটা প্রশ্ন। টুরে যেতে দিতে চায় না। অফিসের গাড়িতে কোন পুরুষের পাশে বসা যাবে না। বাসায় কোন পুরুষ কলিগের টেলিফোন আসা যাবে না। হাজারটা বায়নাক্কা। সেদিক থেকে রিনি খুবই ভাগ্যবান। রিনির সবধরনের কলিগরা ওর স্বামীর খুব ভক্ত। রিনির স্বামী নাকি হেব্বি মাই ডিয়ার। স্বামীর উৎসাহে রিনি বাসায় কলিগদের নিয়ে মাঝেমধ্যেই খানাপিনার আয়োজন করে। স্বামীর অফিসের পিকনিকে যেমন অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিনি যায় তেমনি গভীর উৎসাহ নিয়ে রিনির স্বামী রিনিদের অফিসের কোন প্রোগ্রামে ফিটফাট হয়ে যোগদান করে। বাইরের সবাই জানে রিনি আর আতিক সেরা দম্পতি। এরকম জোড়া আর সচরাচর দেখা যায় না। কেবল রিনির প্রাণের বন্ধু মিতুই জানে রিনির মনের খবর। রিনি নাকি একটু একা হলেই ফিরে যায় তার প্রাইমারি স্কুলের দিনগুলোতে। ক্লাস ফাইভের দশ এগার বছরের মেয়ে তখন ও। ঐ বয়সেই ক্লাসের ফার্স্টবয় টুবলুকে ওর ভালোলাগে। টুবলুর ছিল একমাথা কোকড়া চুল। কালো গভীর চোখ। একটু লাজুক। মাত্র তো সাত-আট মাসের জন্যে টুবলু ওর ক্লাসমেট হয়েছিল। টুবলুর বাবা রিনিদের মফস্বল শহরে এসে সাত-আট মাস পরেই বদলী হয়ে চলে গিয়েছিল ফরিদপুর। রিনির মনে আছে বার্ষিক পরীক্ষায় টুবলু আর ওর ছিট পড়েছিল পাশাপাশি। লিখতে গিয়ে রিনির পেন্সিলের শিশ ভেঙে গিয়েছিল। টুবলু তার পেন্সিল বক্স খুলে তিনরঙা একটা পেন্সিল এগিয়ে দিয়েছিল। অত্তোটুকুন রিনি রিনরিন করে কেঁপে উঠেছিল। মিতু অবশ্য বলে–

'ঐ বয়েসে প্রেম? তুই তো ভারি ইঁচড়ে পাকা'

'কেন রাজলক্ষী নয় বছর বয়েসে শ্রীকান্তের গলায় বৈচির মালা দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল না?'

'তুইও নিলেই পারতি'।

অথচ টুবলুর ভালোনামটা রিনি কিছুতেই মনে করতে পারে না। এই বত্রিশ বছর বয়েসেও পাতলা লম্বাটে শ্যামলা রঙের একমাথা কোকড়া চুলের কোন ভদ্রলোককে দেখলেই রিনি তাকিয়ে থাকে। সে নিউ মার্কেটেই হোক আর অফিস পাড়াতেই হোক। পাশে স্বামী থাকলেও ও তোয়াক্কা করে না। কেবল দেখতেই থাকে। একবার ছোট

বোনের বিয়ের গয়না কিনতে গিয়ে সোনার দোকানে আরও একজন কাস্টমারকে দেখে রিনির বারবার মনে হচ্ছিল এ টুবলু না হয়ে যায়ই না। সেই লম্বাটে একহারা গড়ন, মাথাভরা কোকড়া চুল, গায়ের রঙটা অবশ্য একটু বেশি ফর্সা। বড় হয়ে ফর্সা হয়েও যেতে পারে। রিনির ঘুরে ঘুরে আড়চোখে দেখাটা ভদ্রলোক বোধহয় উপভোগই করছিলেন। ভদ্রলোকও চোরা চাহনিতে রিনিকে লক্ষ্য করছিলেন। রিনি মোটামুটি নিশ্চিতই হয়ে গিয়েছিল টুবলুও ওকে চিনতে পেরেছে ভেবে। অন্যেরা গয়না বাছাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে রিনি অনেক দ্বিধা অনেক প্রস্তুতি নিয়ে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল–

'কিছু যদি মনে না করেন আমি কি আপনার ডাকনামটা জানতে পারি?'

'ডাকনাম যে আমার একটা থাকবেই সেরকম তো নাও হতে পারে'

'না মানে কিন্তু... আপনার ডাকনাম থাকতেই হবে'

'কোন নামটা হলে আপনি খুশি হন?'

এতো মহা বদমাশ। কিন্তু টুবলু এরকম ছিল না। টুবলু ছিল লাজুক প্রকৃতির। রিনির মনে আছে টুবলুরা চলে যাওয়ার আগের দিন টুবলু ওর ছেলে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল। রিনির দিকে একবার তাকিয়েও কিছু বলেনি। রিনিই এগিয়ে সেই তিনরঙা পেন্সিলটা ফেরত দিতে গিয়েছিল। টুবলু শুধু 'ওটা রেখে দাও' বলে আর কিছু না বলে মুখ নিচু করে চলে গিয়েছিল। টুবলু চলে গেলে রিনির কিচ্ছু ভাল্লাগতো না। ওদের ক্লাসের সামনে একটা ডুমুর গাছ ছিল। ডুমুর গাছ থেকে আগেও শুকনো পাতা ঝরতো। কিন্তু রিনির কখনও একা লাগেনি। অথচ টুবলু যাওয়ার পর থেকে ঝরা পাতাগুলো উড়লেই রিনির মনে হতো দুনিয়ায় ওর কেউ নেই। ও একা। ও বাথরুমে গিয়ে ঠোঁটে হাত চেপে কাঁদতো।

রিনিকে ওরা ডাকছিল। রিনি শোনেনি। ও জিজ্ঞাসা করলো–

'আচ্ছা বলুনতো আমার নাম কী?'

'রিনি'

'আপনি টুবলু'

'নারে ভাই, টুবলু গুবলু নই। আপনাকে ওরা ডাকছে। আমার নাম রায়হান মনসুর। ডাকনাম রায়ান'।

সেই তিনরঙা পেন্সিলটা রিনি অনেকদিন রেখে দিয়েছিল। বিয়ের পরও। ওর আলমারি আর কেউ খুলবে না বিয়ের পর রিনি ওর বরকে বলে দিয়েছিল। লক করা না থাকলেও ওর বর কোনদিনও খোলেনি। একদিন আলমারি গোছাতে গিয়ে পেন্সিলটা বিছানার ওপর রাখতেই ওর ছেলে সেটা নিয়ে খেলতে শুরু করে দিল। তারপর একদিন কোথায় যেন হারিয়ে গেল। পেন্সিলটার জন্যে রিনির যে মন খারাপ হতো তাও নয়। ওর মন খারাপ হতো যখন অফিসের একঘেয়েমি কাজ আর বাসার রান্নাবান্না করার জন্যে একটুও একা থাকার সুযোগ পেত না। কারণ রিনির একটাই বিলাসিতা তা হলো স্মৃতি নিয়ে চোখ বোজা। ওর মা ছোটবেলায় কোন নির্জন দুপুরে সবাই ঘুমিয়ে গেলে নিজের পুরোন তোরঙ্গ খুলে বসে বিয়ের শাড়ির ভাঁজ খুলে আবার ভাঁজ করতো। রিনি পাশে

বসে সে শাড়িতে নাক ডুবিয়ে গন্ধ নিত। রিনির স্মৃতি মানে যেন সেইরকম কিছু গন্ধের কাছে আত্মসমর্পন। ও স্মৃতির কাছে হাত পাতলেই শৈশব কৈশোরের গন্ধ পায়। মানুষ বেড়াতে যায়, সিনেমা দেখে, গান শোনে আর রিনি সুযোগ পেলেই পেছনের বারান্দায় ওর শতরঞ্জি পাতা কোণাটাই গিয়ে বসে। ওর স্বামী ওর ভালোলাগাগুলোয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। মানুষটা আসলেই ভালো। মিতু বলে ওর স্বামী নাকি মৈত্রেয়ী দেবীর 'ন হন্যতে'র স্বামীর মতো। মানুষটাকে জোর করে ঠকাতে ইচ্ছে না করলেও বিছানায় একান্তে খুব মৃদু আঁধারে খুব বুকের কাছে যে মাথাটি ও দেখতে পায় সে মাথা কখনও কখনও ঝাঁকড়া কোকড়া চুলের মাথা হয়ে ওর অপরাধবোধ আর একধরনের প্রাপ্তির আনন্দে চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে।

আগে অফিসে কাজ করতে খারাপ লাগতো না। ওর ক্রেডিট সুপারভাইজার ভদ্রলোক ওর অর্ধেক কাজই করে দিত। ভদ্রলোককে সবচে বেশি ঋণখেলাপি অঞ্চলে বদলি করাতে মাইক্রো ক্রেডিট কম্পোনেন্টের উপপ্রধান হিসেবে রিনির এখন ভালো কর্মীর অভাবে খুব দুঃসময় যাচ্ছে। যে মেয়েটি আছে ফাঁকিবাজের হদ্দ। আর নতুন যে ভদ্রলোক যোগদান করেছে তার সাথে কাজ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। এমনিতেই বেঁটেখাটো টাক্কু লোকটাকে দেখলেই মেজাজ খিঁচড়ে যায়। লোকটার মাথাটা দেখলেই ওর মনে হয় উপর থেকে তোলা কোন ফাঁকা স্টেডিয়ামের ছবি। মাঝখানে তেলতেলে টাকের নিচ দিয়ে বৃত্তাকার চুলের গ্যালারি। রিনি নাকি কোকড়া চুলের কাউকে দেখলে তার সাত খুন মাফ করে দেয় মিতু বলে।

'তুই তো একটা আস্ত সাইকি। তোর মাথার মধ্যে কেবল কোকড়া চুল। বরের মাথা যে দিনদিন ফর্সা হচ্ছে সে খেয়াল আছে?'

'কি জানি খেয়াল করিনিতো'

'আহারে বেচারা! তার কী তুই খেয়াল করিস বলতো? হতো আমার গাড়লটার মতো। কাকে বলে এ্যাটেনশন দেখিয়ে ছাড়তো।'

নতুন ক্রেডিট সুপারভাইজার রোজই ফিল্ড থেকে ফিরতে ফিরতে পাঁচটা বাজিয়ে দেয়। বলে পরদিন সব হিসাব বুঝিয়ে দেবে। মাস চলে গেল সন্তোষজনক আদায় দেখাতে পারলো না সে। রিনি রেগে গিয়ে কম্পোনেন্ট প্রধানের কাছে গিয়ে নালিশ করলো–

'স্যার নতুন ক্রেডিট সুপারভাইজার জাকির আলমগীরের পারফরমেন্স ভালো না। ক্রেডিট রিকভারি সন্তোষজনক নয়। এমাসে তার এরিয়ায় সুদসহ দুই লক্ষ টাকা আদায়ের কথা থাকলেও সে জমা দিয়েছে মাত্র পঞ্চাশ হাজার'

'ইটস আনবিলিভেবল। চলুন তাকে নিয়ে কালই বেনিফিসিয়ারিদের কাছে যাবো'।

পরদিন জাকির আলমগীর অফিসে এলো না। মোবাইল বন্ধ। তার কলিগ ফাঁকিবাজ সুরাইয়া অবশ্য বললো শরীর খারাপ টারাপ হতে পারে। কিন্তু শরীর খারাপ বলে মোবাইল বন্ধ রাখার কী হলো? তাছাড়া অফিসে উপস্থিত না হতে পারলে জানাতে

হবে না? অফিসের নিয়মকানুন না মানলে চাকরি থাকবে? তার পরদিনও এগারোটা পর্যন্ত যখন জাকির এলো না তখন সুরাইয়াকে নিয়ে রিনি জাকিরের বাসায় যাবে ঠিক করলো। নিজের কম্পিউটারটা বন্ধ করে হাতে ব্যাগ তুলে নিয়েছে তখনই তার কক্ষের ভেজানো দরজা খুব আস্তে করে ঠেলা দিয়ে একটা নারীমুখ উঁকি দিল।

'ম্যাডাম আসবো একটু?'

'আসুন' বলার আগে রিনি আগন্তুক নারীর আপাদমস্তক দেখে নিল। খুবই সস্তা একটা শালোয়ার-কামিজ পরা মাথায় ওড়না টেনে দেয়া খানিক অসহায় একটা মুখ। মুখটায় কোথায় যেন অত্যাচারের চিহ্ন। রুমে ঢোকার অনুমতি না দিলেও সে যে ঢুকবেই এরকম একটা ভঙ্গী ছিল তার চাহনিতে। কাকে যেন বাইরে বসতে বলে ভেতরে ঢুকে আগন্তুক নারী মাথা থেকে ওড়নাটা ফেলে দিল। উপরের ঠোঁট একদিকে ফুলে বেমানান দেখাচ্ছে। চোখের নিচে কালশিটে। ওরকম অসম ঠোঁটে আবার এবড়ো থেবড়ো করে লিপস্টিক দেয়া। স্বাভাবিক চেহারাটা কেমন হতে পারে ভদ্রমহিলার ভাবতে ভাবতেই রিনি লক্ষ্য করলো সে কিছু বলতে উদগ্রীব।

'সরি, কে আপনি? কী হয়েছে?'

'আমি মিসেস জাকির আলমগীর' –বলে ওড়নার খুঁট দিয়ে চোখের কোণা মুছলো।

'আমি বাধ্য হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আমার মুখ দেখেই নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমার উপর দিয়ে কী ঝড় গেছে। উনি একজন জুয়াড়ি। ঋণের টাকা আদায় করে ব্যাংকে জমা না দিয়ে নিজের কাছে রেখে জুয়া খেলেন। জিতলে কিছু জমা দেন। হারলে আবার আদায় করে আবার খেলেন। ছেলের স্কুলের বেতন দেয়া হয়নি চারমাস। স্কুল টিসি দেবে বলেছে। আমি গত পরশু টাকার ব্যাগ কেড়ে নিয়ে বলেছিলাম আমি অফিসে গিয়ে সব বলে দেব। আমাকে আমার ছেলের সামনেই মেরে এই হাল করেছে'–বলে মিসেস জাকির ধরা গলা একটু কেশে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেন।

'কিন্তু জাকির সাহেব কোথায়? মোবাইল ধরেন না কেন?'

'আমাকে মেরে ধরে ঐ যে বেরিয়ে গেছেন আর ফেরেননি'।

রিনি উঠে এসে মিসেস জাকিরের পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললো–

'চলুন স্যারকে গিয়ে বলুন সব। আমরা তো এখনই আপনাদের বাসার দিকে যাচ্ছিলাম'।

মিসেস জাকিরের হাত ধরে রুম থেকে বেরোতেই রিনি দেখলো ভদ্রমহিলা একটু দূরে একটা চেয়ারে বসা দশ এগারো বছরের একটা নতমুখ ছেলের হাত ধরে উঠতে বললেন। ছেলেটা রিনির দিকে যতই এগিয়ে আসে রিনি ততই পেছাতে থাকে শৈশবে। কাছে আসতেই মিসেস জাকির ছেলেটিকে বললেন–

'সালাম দাও বুবলু। ইনি তোমার বাবার বস।'

অবিকল টুবলু। সেই একমাথা কোকড়া চুল। গভীর চোখ। লাজুক চাহনি। ঠিক এই বয়েসেই টুবলু যে মেয়েটিকে একা রেখে চলে গিয়েছিল সেই মেয়েটি আজও মাঝে মাঝে ভীষণ একা হয়ে পড়ে। সেই মেয়েটির সুখী চারকোন হঠাৎ কেমন মুহূর্তে পানসে হয়ে যায়। যে মেয়েটির অদ্ভুত ভালোমানুষ স্বামী বুকের মধ্যে মেয়েটির জন্যে অনেক ভালোবাসা জমিয়ে রেখেও প্রাপ্তির জন্যে কখনও হাত পাতে না।

'ওর ভালো নাম আদিত্য আলমগীর। বাবার ডাকনামের সাথে মিলিয়ে বুবলু বলে ডাকি আমরা।'

সে রাতে বারান্দার শতরঞ্জিতে বসে ছেলেকে বুকে নিয়ে অনেক কাঁদলো রিনি। স্বামী একবার এসে দেখে গেল। কিন্তু কিছুই জানতে চাইলো না। কারণ রিনির কান্নায় এক অপরাধীর কান্নার চিত্র ফুটে উঠতে দেখলো সে। সে কান্না একা একাই থামার কান্না। রিনি অনেক রাতে এই প্রথম স্বামীর মাথা বুকের মধ্যে চেপে ধরে আবার কাঁদলো। স্বামী কিছুই জিজ্ঞাসা করলো না। কেবল রিনির বুকে কান দিয়ে বারবার নদীর পাড় ভাঙার শব্দ শুনতে পেল। রিনি স্বামীর মাথায় বিলি কাটতে গিয়ে তেমন পর্যাপ্ত চুল খুঁজে পেল না। কিন্তু বললো–

'ঘন কোকড়া চুল দেখলে আমার গা ঘিন ঘিন করে। আমার এ-ই ভালো।'

স্বখাত সলিল

প্রথম গাইটা মারা গেলেও কোন সন্দেহ দানা বাঁধেনি মধু বা তার নতুন বউ সবেদার মনে। মরতেই পারে। যে বছর খুব ঝড় হলো সে বছরও মধুদের তিনটা গাইয়ের মধ্যে একটা মাঠ থেকে বেলাবেলি নিয়ে আসার পরও কেমন নেতিয়ে পড়ে মাঝরাতেই মারা গেল। ওর বাপ বলছিল নির্ঘাৎ সাপে কেটেছে। মা তা কিছুতেই মানতে চায়নি। তিনটে গাইয়ের একটা ছিল গাভিন। বাকি দুটো তিনবেলা আট সের দুধ দিত। দুধ বেচে মা বাপ আর বেটার তিনটা পেট ভালোমতো চলেও ওরা মাসে একবার গঞ্জের সিনেমা হলে গিয়ে ভালো বই দেখে আসতো। সিনেমা দেখে ফেরার পথে ওরা গনেশের মিষ্টির দোকানে গিয়ে বসতো। একটা রসগোল্লা মধুই খেত। কেবল রস দিয়ে ওর মা আর বাপ লুচি ভিজিয়ে পরম তৃপ্তিতে খেয়ে উঠে চাঁদের আলোয় নদীর ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতো। হ্যাঁ, সে-ও হয়ে গেল কতোকাল। এখন আর মাও নেই, বাপও নেই। সবেদাকে বিয়ে করে আনার এক সপ্তাহের মধ্যে মধুও বউকে নিয়ে সিনেমা দেখে এসেছে। গনেশের দোকানটা উঠে গেছে। ওই দোকানের জায়গাটায় কারা যেন ধানের কল বসিয়েছে। মধু বউ-এর কাছে গনেশের মিষ্টির গল্প করলেও সেবার মিষ্টি খাওয়াতে পারেনি। দুটো গাইয়ের একটা গাভিন হয়েছে। বিয়ালেই দিনে চার সের। তখন কিছু টাকা জমিয়ে ইস্টিশনের হোটেলে বউকে বিরানি ভাত খাওয়াবে। কিন্তু দশদিন না যেতেই যখন ওদের রুটি রুজির একমাত্র সম্বল দ্বিতীয় গাইটাও মুখে ফেনা উঠে মারা গেল তখন সবেদার আর বুঝতে বাকি রইলো না এ কার কারসাজি।

'ভুরুল খুকা ছাড়া এ কাজ আর কারুর না, এই আমি তুমাক বুইলি থুলাম'

'আমারু সন্দ ওই সুমুন্দিকেই। কিন্তুক না দেইখি নালিশ দেব কার ঠিন?'

ওদের নালিশ মোড়ল গ্রাহ্য করবে বলে মধুর বিশ্বাস হয় না। একে ভুরুল খুকার বাপের যথেষ্ট টাকাকড়ি। মসুরির আড়তে গত বছর তিনশো বস্তা মসুরি মজুত করে সে মোটা মুনাফা অর্জন করেছে। এবার রেখেছে রসুন। রসুনেরও খুব দর। যদিও মাস্টার চাচার উপস্থিতিতেই মধুর সাথে সবেদার বিয়ে হয়েছে কিন্তু মোটা ভুরুর খুকামিয়ার তাতে খুব রাগ। সবেদার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর নেউলের জোড়া লেজের মতো তার ভুরু যেন সবসময় কুঁচকে থাকে। গ্রামে খুকা নামের ছড়াছড়ি। ছোটখাট খুকাকে ডাকা হয় পিঁপড়ে খুকা, বিশাল বপুর খুকাকে হাতি খুকা, ভারত থেকে দেশভাগের সময় আসা এক খুকা রিপুজি খুকা, একচোখ কানা খুকা দেড় ব্যাটারি খুকা। মুখের মধ্যে ভুরুর আতিশয্য থাকার জন্য শাকের মিয়ার আকাইম্মা বেটাকে ভুরুল খুকা নামেই মানুষ আড়ালে ডাকে। ভুরুল খুকার খুব ইচ্ছে ছিল সবেদাকে ঘরে তোলার। কিন্তু খুকার বাপ নিখাগি ঘরের মেয়েকে বউ করবে না তা স্পষ্ট বলে দিয়েছিল। তাছাড়া মধুর সাথে সবেদার ভাব-ভালোবাসার কথা গ্রামের কে না জানতো। কেবল সুন্দরী হলেই তো হয়

না। টাকাআলা বাড়ির ছেলের বিয়ে হবে মোটরসাইকেল যৌতুক নিয়ে। পরের জন খাটা মামার কাছে মানুষ হওয়া মা-বাপ মরা হাভাতে মেয়ের সাথে কী দেখে বিয়েতে বাপ রাজি হবে?

'বিয়ি কইরবো আমি, আমার এট্টা শখ-শান্তি আছে না? আপনি বাপকে বুজান চাচা'–মাস্টারকে একদিন একা পেয়ে ভুরুল খুকা প্রায় হাত পায়ে ধরে। প্রাইমারি স্কুলের রিটায়ার্ড তছের মাস্টার ঐ গ্রামের শিক্ষিত মুরুব্বি। বিয়ে-থা, ভালোমন্দে সবাই মাস্টারের পরামর্শ নিতে যায়।

'ওরে নাদান, ছুড়িডা মদুর সাত ভালোবাসা করে। তোর সাতে বিয়ি বসলি তো?'

'উর মামুকে যদি ট্যাকার নোভ দেকায়, থালি পরেও?' টাকা দিয়ে যে অনেক অনৈতিক কাজ জায়েজ করা যায় সদ্য বড়লোক বাপের বেটা তা জানে।

'মামুর কইলজির টুইকরো ঐ ছবে। সামনে আশ্বিনিই দিন ফেইলিচে। মধু মাসখানেক সুমায় চায়িছে। উর একটা গাই গাবিন। গাই বিয়ালিই বিয়ি'।

'আপনি তালি আমার জন্যি কিছুই করতি পারবেন না?'–বলে খুকা এমনভাবে দপদপিয়ে বেরিয়ে যায় যে চলার ভঙ্গীতে প্রতিশোধের স্পষ্ট আভাস দেখতে পায় মাস্টার।

মধু বাপ-দাদার পৈতৃক ব্যবসা গরু পোষা আর দুধ বেচা ছাড়া আর কিছুই পারে না। তার বড় সাধের সবেদাকে সে প্রথম ঘরে তুলে কাঁসার ঝকঝকে গ্লাসে এক গ্লাস দুধ আর বাটিতে জমিয়ে রাখা দুধের সরের উপর চিনি ছড়িয়ে বউ বরণ করেছিল। ঘন সর আঙুলে করে বউয়ের মুখে তুলে দিয়ে মধু বলেছিল–

'দুধ বরণ কইন্যা তুমার আলতা বরণ গালে
পিরিতির সর তুইলি দিলাম এই বাসরের কালে'।

গাই দুটো মরার পর মধু-সবেদার মাথায় হাত। ওদের সুখের চৌচালায় যেন অভাবের আগুন লাগিয়ে দিল কেউ। জমানো টাকায় কয়েকদিন চলার পর বাছুরটা বিক্রি করে এলো মধু। সবেদা মানুষের বাড়ি গতর খেটে দুজনের পেটের ভাত জোগাড় করতে চেয়েছিল মধু তাতে রাজি হয়নি। না খেয়ে মরে গেলেও সে বউকে পরের বাড়ি পাঠাবে না।

'খেত খামারের কাজও তো কিচু শেকোনি। এ্যাকুন পেট চলবে কিরাম কইরি?'–বলে সবেদা লম্ফটা তুলে ধরে দেখে তাতে তেলও শেষ হয়ে আসছে। এক ফুঁয়ে তা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় হাঁটুতে মাথা দিয়ে বসে থাকে।

'ভুরুল শুয়োর যে এরাম কইরি পেত্তিশোধ নেবে তা কিডা জাইনতো? আমার মনে হয় বড় গাইডাকেও ওই সুমুন্দিই গ্যামা খাওয়াইছিলু'

'আমাগের নিঃস্ব কইরি উর কি লাভ?'

'সুকি থাকতি দেবে নারে বউ সুকি থাকতি দেবে না। তোক না পায়ি ভুরুলির বাইচ্চা খ্যাপা কুকুর হয়ি গিইচে'

'আমি এ্যাকুন কনে যাবো? আমাগের দিন কাটবে কিরাম কইরি?' বলে সবেদা অনেক রাত অব্দি ঘুনঘুন করে কাঁদতে থাকে। মাথার নিচে দুহাতের পাতা বিছিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে মধু। তার মাথায় কিছু আসে না। চাষের কাজ কিছুই জানে না বলে গ্রামের মানুষতো তাকে কেউ জমি নিড়াতেও ডাকবে না। দশ মাইল দূরে কালিদাশপুরের কুমার নদীর উপর ব্রিজ বানাচ্ছে সরকার। সেখানে ইট টানার কাজ পেতে পারে সে ভাবছিল। আর কিছু না পারুক ইট টানতে কোন অভিজ্ঞতা লাগে না। কিন্তু সবেদাকে সারাদিনের জন্য বাড়িতে একা রেখে যেতে ওর মন টানছে না। ভুরুল খুকাকে সে বেশ কয়েকদিন তাদের বাড়ির আশপাশ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছে। দু'আটি বিচালির মতো তার মোটা ভুরুর নিচ দিয়ে সে কুতকুতে চোখে বাড়ির মধ্যে দৃষ্টি ফেলেছে। গরু দুটো মেরেছে, এবার যদি সবেদার গায় হাত দেয়? ওর মতো হতদরিদ্রের কী আছে যে ও তা দিয়ে সামলাবে? তবু ভরসা মাস্টার চাচার মতো লোক আছে গ্রামে। অন্তত তার কাছে গিয়ে বিচার চাইতে পারবে। কিন্তু ঘরে তো একেবারে কিছুই নেই। সকাল হলে দুটো পেটে কিছু তো পড়তে হবে।

'আল্লাগো তুমি ভুরুলির বিচার করো। আমার এতোবড় ক্ষেতি যে কইরলো তার শাস্তি তুমি দিউ খুদা'–শেষরাতে বিড়বিড় করতে করতে চোখ দুটো যেই না একটু লেগে এসেছে মধুর ওমনি সে যেন শুনতে পেল তার ঘরের পেছনের ঝোঁপের মধ্যে থেকে ধস্তাধস্তির শব্দ আর সবেদার চিৎকার। না, পাশে সবেদা নেই। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে লুঙ্গির গেরো কোমরে বাঁধতে বাঁধতে মধু উর্ধ্বশ্বাসে ঝোঁপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখলো সবেদা আতঙ্কিত মুখে বোবাকান্নার মতো শব্দ করতে করতে বদনা হাতে বাড়ির দিকে ছুটে আসছে। হালকা কুয়াশা আর ঢিমে আলোয় একটা মানুষ উল্টোদিকে দৌড়ে পালাচ্ছে। মধু সবেদার দিকে না তাকিয়ে পলায়নরত মানুষটির পেছনে 'ধর ধর' 'চোর চোর' বলে ছুটতে থাকে। মাস্টারও ভোরের আলো ফোটার আগেই মেছওয়াক করতে করতে সে পথ দিয়েই আসছিল। মাস্টার স্পষ্ট দেখতে পেল তাকে পাশ কাটিয়ে শা করে পালিয়ে গেল ভুরুল খুকা। মধুর চিৎকারে ঐ শীতের ভোরে আরো দুচারজন আশপাশ থেকে বেরিয়ে এলো। মাস্টার মধুকে আটকালো। মধু কাঁদতে কাঁদতে যা বললো তা শুনে জড়ো হওয়া মানুষের মধ্যে একধরনের ধোঁয়াশা সৃষ্টি হলো। মাস্টার মধুর ঘাড়ে হাত দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললো–

'সবেদা বাড়ি একা। তুই যা। আমি বেলা উঠলিই ইর বেবুস্তা করছি।'

উৎসুক মানুষগুলো এ ওর কানে কানে কী সব বলতে বলতে বেলা ওঠার অপেক্ষায় মুন্সিদের বড় দহলিজে অপেক্ষা করতে লাগলো। মধু ধীর পায়ে ঘরের পথে পা বাড়ালো। ওর চলায় কোন তাড়া ছিল না। মুখে দুঃশ্চিন্তার ছাপও না। সরলসোজা, কূটবুদ্ধিহীন, বউ-পাগলা মধু ভাবছিল ঘটনাটা কীভাবে সাজিয়ে ভুরুলের বাপের কাছ থেকে দুটো গাইয়ের দাম আদায় করা যায়।

মধু সবেদাকে কিছুই জিজ্ঞাসা না করে ঘরের দেয়ালে মাথা দিয়ে বসে রইলো। সবেদা চোখমুখ মুছতে মুছতে স্বামীর গা ঘেষে ভয়ে ভয়ে বসলো। মধু হাত বাড়িয়ে বউকে আরো কাছে টেনে নিল। সবেদা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। বললো–

'হারামির বাইচ্চা আমাক্ চাইপি ধরার আগেই আমি পলাইছি। আমার কুনু ক্ষেতি করতি পারেনি। আল্লার কিরি'

'আমি জানি। তেবে তা বিচারের সুমায় স্বীকার কত্তি হবে। আমার দুইট্ট গাইয়ের দাম আমি উর কাছতি আদায় কইরি ছাইড়বো'

'কিরাম কইরি?'

মধু সবেদাকে পাখি পড়ানো করে শেখালো যে বিচারের সময় সবেদা যেন স্বীকার করে যে ভুরুল খুকা তার শ্লীলতাহানী করেছে। সে ক্ষতিপূরণ চায়। মধু মনে মনে হিসাব করে দুটো গাইয়ের দাম সাড়ে তিন হাজার করে ধরে সে টাকা দাবি করার কথা বলতে বললো সবেদাকে। সাত হাজারে রাজি না হয়ে যদি পাঁচ হাজারেও রফা হয় তাতেও ক্ষতি নেই। সবেদা থ মেরে বসে রইলো। খানিক পর বললো–

'কিন্তুক মিছি কতা বুইলি আমার নিজির সর্বনাশ নিজি কইরবো? গিরামের লোকজন কোন চোকি দ্যাকপে আমাকে? তুমার মান সম্মান কিছু থাকপে?'

'যাগের পেটে ভাত নি তাগের আবার মান সম্মান। দুনিয়ার লোক কী ভাইবলো না ভাইবলো আমার তাতে কিচু যায় আসে না। আমি তো জানি তোর কুনু ক্ষেতি করতি পারেনি কুকুরডা। আর ক্ষেতি যদি কিছু কইরতোই তাতে তোর দোষ কী? আমাক্ ছাড়া তোর কি আর কারু কাছ কৈফোত দিতি হবে?

'অতোবড় কেলেম নিয়ি গিরামে টিকতি পারইবো?'

'ট্যাকাগুনু হাতে পালিই রাতারাতি দুইজোন পলি যাবো দর্শনার বডারে। খালি সালিশির সুমায় যা শিখি দিলাম সেইরাম বুলবি। এই গিরামের গুষ্টি কিলাই'।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে গ্রামের মানুষ সব মুন্সিদের বড় দহলিজে ভেঙে পড়লো। কীভাবে যেন বিদ্যুৎগতিতে ঘটনাটা সারাগ্রাম ছড়িয়ে পড়লো। কানাঘুষা চলতে লাগলো। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই নিশ্চিত যে ভুরুল খুকা সবেদার শ্লীলতাহানী করেছে। এ কাজ সে করতেই পারে। সবেদাকে না পেয়ে সে যে খ্যাপা কুকুর হয়ে উঠেছিল তা আর কে না জানে? বিচার কাজ শুরু করলো মাস্টার। মাস্টারের পাশে বসে ভুরুল খুকার বাপ খুব শরমিন্দায় মুখ নিচু করে থাকে। মাস্টারের কানে কানে বারবার কী যেন বলতে থাকে। আরও দুচারজন মুরুব্বি তাড়া দিল মাস্টারকে বিষয়টা উত্থাপন করার জন্য। আসামী ভুরুল খুকাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হয়–

'সত্যি কতা বুলবি। তুই কি সবেদাক অপমান করিছিস?'

'না। আমি তার গায়উ হাত দিইনি'

'তেবে ঝোঁপের মদ্যি কী কাজে ঢুকিছিলি?'

'বাহ্যি ফিরতি'

'এতো জাগা থাকতি মদুগের ঝোঁপের মদ্যি ক্যানে?'

'ঐ পথ দিয়ি আসার সুমায় বেগ উইটলো'

'সবেদা চেঁচি উইটছিলো ক্যান?'

'তা আম জানিনি'।

এবার সবেদার পালা। মাস্টার সবেদাকে স্নেহের চোখে দেখে। তার অপমানে মাস্টার বাস্তবিকই মনক্ষুণ্ন। সে মনে মনে চাচ্ছিল ভুরুল খুকার যেন একটা জবরদস্ত শাস্তি হয়ে যায়। লজ্জায় অধোবদনে সবেদা যেন মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিল। মানুষজনের কানাঘুষা ওর কানে আসছিল। অল্পসংখ্যক লোক আবার ভুরুল খুকাকে সমর্থন করছিল। তবে মধুর দিকেই বেশিরভাগ। কেননা ভুরুল খুকার বেয়াদবি আর হামবড়া ভাব দেখে দেখে গ্রামের মানুষ অতিষ্ট। মাস্টার সবেদাকে সওয়াল-জবাবের জন্য সামনে এসে দাঁড়াতে বললো।

'খুকা কোন সুমায় তোর কাছে আসে?'

গলা ঝেড়ে মাথার কাপড় নামিয়ে দিয়ে মধুর দিকে একবার তাকিয়ে সবেদা অদৃঢ় স্বরে মিনমিন করে বলে–

'আমি কেবলই বদনা হাতে উইটি দাঁড়াইছি আর দেখি কি ছামনেই...'

'তোর কুনু ক্ষেতি কইরিচে সে?'

সবেদা অসহায় দৃষ্টি নিয়ে মধুর দিকে তাকায়। মধুর চোখে সম্মতি পড়ে নিয়েও সবেদা খানিক চুপ করে থাকে। কিছুক্ষণ পর ঘাড় নামিয়ে বলে–

'হয়'

'কেউ দেইখিছে?'

মধুর দিকে আঙুল তুলে সবেদা বলে–

'সে-ইতো দেইখিছে'

'কী দেইখিছে?'

'আমি জানিনি আল্লাগো...' বলে সবেদা অসহায়ের মতো কাঁদতে শুরু করলো। সবেদা মিথ্যে বলার জন্য যত কাঁদে মানুষজন ভাবে সবেদা তার ইজ্জতহানির কথা ভেবে আকুল দিশেহারা। মধুর কাছেও বিষয়টা খুব অস্বস্থিকর লাগছিল। বউকে যে কারণে মিথ্যে বলতে বলেছিল তা ক্রমশই বউকে বিশ্রি জবাবদিহিতার মুখে ফেলছে দেখে আর দেরি না করে উঠে দাঁড়িয়ে মধু বললো–

'আমার বো, আমি তো আর মিত্তি কতা বুইলবো না। এ অপমানের ছাস্তি আমরা চাই'। মধু তখনই মনে মনে দুটো গাই গরুর মূল্য হিসাব করে টাকার অঙ্কটা বলবে বলেও অতো তাড়াতাড়ি বলে ফেলার জোরালো যুক্তি আগে খুঁজতে লাগলো।

মাস্টার জিজ্ঞাসা করলো–

'ছাস্তি তাকে পাতিই হবে। কারণ আমার নিজির চোকের ছামনে দিয়ি সে ঝাইড়ি দৌড় মাইরছিলু। তার চোকি-মুকি অপরাদের চিহ্ন আমি দেখিছি। আপনারা সাব্যাস্ত করেন কী ছাস্তি তাক দিয়া যায়'।

এমন সময় ভুরুল খুকা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। যদিও সে সবেদার শ্লীলতাহানী করতে পারেনি কিন্তু মধুর দু'দুটো গাই কৌশলে সে-ইতো মেরে ফেলেছে। অপরাধী যতই ভয়ঙ্কর হোক না কেন তারা খুব দুর্বলচিত্তের হয়ে থাকে। সে বলতে লাগলো–

'আমি কিছু করিনিগো। উরা মিত্তি কতা বোলচে। আমাক আপনারা মাপ কইরি দেন গো।'

ভুরুল খুকার বাপ শাকের মিয়া খুব অপমানিত হতে লাগলো। মাস্টারের কানে কানে কী সব বলতেই মাস্টার ঘোষণা দিল–

'শাকের মিয়াও খুব শরমিন্দা। তার ছেইলির হয়ি সে মদুর কাছে ক্ষ্যামা চাচ্ছে। ক্ষেতিপুরণ হিসাবে দশ হাজার ট্যাকা দিতি চায় সে। মধু আর সবেদা কি তাতে রাজি?'

সবেদা ঝটতি ঘোমটার মধ্যে দিয়ে মধুর দিকে নজর ছুড়ে দেয়। মধু আনন্দে প্রায় লাফিয়ে ওঠার জোগাড়। মধু ঠিক যা চাচ্ছিল তা-ই ঘটতে যাচ্ছে। এ যেন স্বপ্নেরও অতীত। ও ভাবছিল কীভাবে টাকার কথা ও উঠাবে? টাকা দিয়ে কি ঘরের বউ-এর ইজ্জতের দাম হয়? কত টাকাই বা চাইতে হবে? ও তো ভেবেই রেখেছিল ছ'সাত হাজার টাকা পেলেই ওদের চলবে। ওতো অন্যায় কিছুই ভাবেনি। তার জীবিকার সম্বল দুটো তো ভুরুলই শেষ করে দিয়েছে। এই কূটকৌশলটুকুর আশ্রয় না নিলে দুটো মানুষের পেট চলবে কী করে? আর যখন গাইদুটো মেরে ফেলা ওরা কেউ নিজে চোখে দেখেনি তখন ওদুটোর জন্য কীভাবে ক্ষতিপুরণ দাবি করবে? হ্যাঁ, সবেদাকে দিয়ে মিথ্যা বলতে বলাতে ওরও যে কতোখানি দ্বিধা আর সংকোচ কাটিয়ে উঠতে হয়েছে তা শুধু সে নিজেই জানে। গাই দোয়া আর দুধ বেচা ছাড়া যে মধু আর কিছু শেখেনি। মানুষ তার সুখের সংসার দেখে হিংসা করতে পারে, আর সে দুটো পেটের জন্য এইটুকু মিথ্যা বলতে পারবে না? আর একেবারে জলজলা মিথ্যেই বা কোথায়? সবেদা চেঁচিয়ে না উঠলে ও শুয়োর সবেদার গতরে তো হাতও দিত। ও যা ভেবেছে ভালোই ভেবেছে। সবেদাও তো বিষয়টা বুঝেই স্বামীকে সহযোগিতা করতে অভিনয় করেছে। সবেদাকে তো জোর করে মিথ্যে বলতে বলেনি। দুচোখ দুহাতের পিঠ দিয়ে ডলে দেয় মধু। যেন দেখতে পায় সে আর তার সোহাগের বউ একটা পোটলায় কাপড়চোপড় বেঁধে নিয়ে রাতের আঁধারে তাদের গ্রাম ছাড়ছে। দশ হাজার টাকার বান্ডিলটা কোমরে গামছার সাথে বেঁধে সে বউএর হাত ধরে সন্তর্পনে ছোট খাল পার হচ্ছে। ওপারে ভোরের লাল সূর্যের প্রথম ডালিম রোদ সবেদার মুখে এসে পড়লে সবেদাকে যেন মনে হচ্ছে রূপকথার রাজকন্যা। ছবির মতো একটা বাড়ির মধ্যে গরু দুইয়ে এক বালতি দুধ তুলে দিচ্ছে মধু সবেদার হাতে। সবেদার ডুরে শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে নিচ্ছে মধু।

মধু ঘাড়ের গামছা দিয়ে মুখ মুছে নিল। মুখে তার রাজ্যের প্রশান্তি। সে দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করলো–'হবে। আমরা এ পোস্তাবে রাজি।' আবার নতুন কোন প্রস্তাব উঠার ভয়ে মধু তড়িঘড়ি বিচারকদের দিকে এগিয়ে যেতে পা বাড়ায়। তার আগেই মাস্টারের পাশে বসা সাবদার মোড়ল এবার উঠে দাঁড়ালো।

'ট্যাকা দিয়ি যদি সব কিছু মিটি য্যাতু, তালি পরে আর সমাজে বিচার আচার বুলতি কিছু থ্যাইকতু না। এ বিচার আমরা মানিনি'।

উপস্থিত জনতার মধ্যে শোরগোল উঠলো। যারা একটু আগেই মধুকে সমর্থন করছিল এ বিচার তারা অনেকেই মানতে চায় না। সবেদা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। মধু অস্থির হয়ে উঠে গিয়ে মোড়লের হাত চেপে ধরলো। স্বপ্ন বুঝি তার ভেস্তে যেতে বসেছে। মাস্টার তাকে জায়গায় বসতে বলে মোড়লকে জিজ্ঞাসা করলো–

'দুই পক্ষই যকুন রাজি তকুন এ বিচার মাইনি নিতি অসুবিদা কনে?'

মোড়ল কঠিন মুখে রায় দিল–

'যে পরের বউকে নষ্ট করে ট্যাকা দিয়ি তার সাজা হয় না। আর নষ্ট বউকে ঘরে রাকার কুনু অদিকার মদুরও নি'।

উত্তেজিত জনতা 'হক কতা, হক কতা' বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

'ইর শাস্তি হচ্চে – মদু এই আসরে সবেদাকে তালাক দেবে, আর খুকার সাতে সবেদার নিকি পড়ানো হবে'।

সবেদা 'আল্লাগো! কী করলাম আল্লারে! সব মিত্যি কতা, সব মিছি কতা' বলে মুর্চ্ছা গেল। মধু একবার ভুরুল খুকার বাপের হাতে ধরে, একবার মাস্টারের কাছে গিয়ে হাত জড়ো করে দাঁড়ায়, একবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠে মোড়লের পা জড়িয়ে ধরে বলে–

'চাচাগো, আমি ট্যাকা চাইনি, গরু চাইনি, এ গিরামেও আমরা থ্যাইপো না। আর যে ছাস্তি দিয়ার দেন, খালি সবেদাকে কাইড়ি নেবেন না। উর কুনু দোষ নি। সব দোষ আমার।'

পাগলপ্রায় মধুর উল্টোপাল্টা কথা কেউ কানে নিল না।

পরম্পরা

আমার ছেলের বয়স যখন মাত্র সাত বছর তখন ও আমাকে আমার আব্বার সামনে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মা, বেশ্যা কী'? আমি খানিক ঢোক গিলে ঘরের বাইরে থেকে কেউ না ডাকলেও গলা বাড়িয়ে 'আসছি' বলে তড়িঘড়ি বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আমার আব্বা শিক্ষিত সংস্কারমুক্ত মানুষ। ছেলেকে তার কাছ থেকেই দীক্ষা নেবার জন্যে বসিয়ে রেখে এসেছিলাম। বাবা কী বুঝিয়েছিলেন জানিনা কিন্তু সে আমাকে ও সম্পর্কে আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। কিন্তু ছেলে কোত্থেকে ঐ শব্দটি আবিষ্কার করলো তা জানার জন্যে বেশি গবেষণা করতে হলো না। যেদিন বাবার বাড়ির গ্রাম থেকে ঢাকা ফিরছিলাম সেদিন রিকশা করে স্টেশন যাওয়ার পথে গ্রামের চৌরাস্তার মোড়ে দেখতে পেলাম এক অশীতিপর বৃদ্ধাকে একদঙ্গল শিশুকিশোর পেছন দিক থেকে 'বেশ্যা' 'বেশ্যা' বলে খেপাচ্ছে। আমার ছেলেও দেখলো। কিন্তু আমাকে কোন প্রশ্ন করলো না।

দেখলাম শতচ্ছিন্ন শাড়িতে বৃদ্ধার শরীর পেঁচানো। ভাঙা কোমর নিয়ে কুজো হয়ে নদীতে গোসল করতে যাচ্ছে। কোমরে পেঁচানো সরু দড়িতে আটকানো প্রায় শতাধিক চাবির গোছা হাঁটার তালে তালে ঝুম ঝুম করে বাজছে। বৃদ্ধা সমানে গালি গালাজ করে চলেছে বাপ মা তুলে। সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপও নেই। যে বয়সের শিশুরা বৃদ্ধাকে 'বেশ্যা' ডেকে বিরক্ত করছিল তারা হয়তো আমার ছেলের মতোই শব্দটির অর্থ জানে না কিন্তু শব্দটার জন্য বৃদ্ধা যে অস্পৃশ্য তা বুঝতে পারে। তারা বৃদ্ধার কোমরের চাবি ধরে টানাটানি করছিল। শিশুরা বৃদ্ধার কদর্য গালির অর্থ বুঝতে পারলে আর তার সাথে ঝামেলা করতো না। তার শরীরে চামড়ার ভাঁজগুলো দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কেউ পেন্সিল স্কেচ করেছে। একটু কাছ থেকে মনে হচ্ছিল কুচিয়ে রাখা শাড়ি। দুহাত দিয়ে টান দিলেই একটা টান টান শাদা মসলিন পাওয়া যাবে। দুধসাদা পা দুটোর চারপাশ যেন আলো ছড়াচ্ছিল। রিকশা থেকে ঝুঁকে মুখটা দেখার চেষ্টা করলাম। ছানিপড়া চোখ, হাতে লাঠি, কানের লতি চেরা, কিন্তু অপূর্ব সুন্দর চাঁদকপাল ভাঁজহীন লাবন্যময়। চোখের ডানদিকে কালো তিল নজরে পড়তেই মুহূর্তে স্মৃতির রোদ হাত ধরে আমাকে যেখানটায় পৌঁছে দিয়ে গেল সেখানে দাঁড়াতেই যে নামটা অবলীলায় মুখ দিয়ে অস্ফুটভাবে বেরিয়ে এলো তা 'জুলিয়া'।

আমাদের মফস্বল শহরের কলেজের পাশেই ছিল উঁচু দেয়ালঘেরা বিখ্যাত বেশ্যালয়। অনেক কানাঘুষো হতো ওটা নিয়ে। ওটা নাকি বৃটিশ আমলের। ইংরেজ সাহেবরা পর্যন্ত ওখানে যাতায়াত করতো। আমরা অফ-পিরিয়ডে সেই লাল প্রাচীরের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাদাম খেতাম আর কৌতুহলে কোথাও জুলিয়াকে দেখা যায় কি না তার চেষ্টা করতাম। সবার পরিবারের পক্ষ থেকে ঐ নিষিদ্ধ এলাকার পাশে হাঁটাহাঁটি

করা নিষেধ ছিল কিন্তু জুলিয়াকে নিয়ে আমাদের কৌতুহল ছিল অপরিসীম। জুলিয়ার সৌন্দর্য মানুষের মুখে মুখে ঘুরতো। অনেকে বলতো তার অরিজিন সাহেবদের বলে সে অতো সুন্দর। সে অন্ধকারে হাঁটলে নাকি চারপাশে বিদ্যুৎ খেলতো। তার গ্রাহকও ছিল হাতে গোনা কিছু অভিজাত পুরুষ। তো একবার আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল তাকে দেখার। আমরা কজন বন্ধু মিলে কলেজ পালিয়ে ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। লেডিস ওয়েটিং রুমের মধ্যে ঢুকতেই একটা চেয়ারে মাথায় ঘোমটা টেনে বসা এক ভদ্রমহিলাকে দেখে থমকে গেলাম। কোলের উপর দুহাত বিছানো। দুটো সরু সোনার চুড়ি যেন হাতের সোনারঙে 'কে কার অলংকার'-এর উদাহরণ হয়ে বসে ছিল। চোখে মুখে কোথাও প্রসাধনের ছিটেফোঁটা নেই। নিজের রঙে ঠোঁটদুটো কমলার কোয়ার মতো। মুখখানা বত্তিচেল্লির ভেনাসের মতো বিষণ্ন। এতো সুন্দর মুখ কেবল কোন পৌরাণিক রাজকন্যারই হতে পারে। সবচে যে জিনিষটা আমাকে চমৎকৃত করেছিল তা তার বসার ভঙ্গী। যেন রাণি ভিক্টোরিয়া তার সিংহাসনে বসে আছেন। ত্রিশ বত্রিশ বছরের পরিণত বয়সের অধরা ব্যক্তিত্ব তার সমস্ত শরীর জুড়ে। আমার এক বন্ধু ডলি কানে কানে বললো–'একদম মনে হচ্ছে রাজলক্ষী, তাই না?' আমরা তখন সবে 'শ্রীকান্ত' শেষ করা বিদগ্ধ পাঠক। বেশ্যা বলে ঘৃণা করবো কি, মনে হচ্ছিল সে যদি আমাদের সাথে একটু কথা বলে তাহলে আমাদের সাতপুরুষ ধন্য হয়ে যাবে । ততক্ষণে লেডিস ওয়েটিং রুমের জানালা হয়ে দাঁড়িয়েছে আসল সিনেমার গ্যালারি। ঘন্টা পড়লে হলের দরজা খুলে গেল। আমরা সম্ভ্রমে সরে দাঁড়ালাম। হাঁটার সময় তার খালি পা নজরে পড়লো। পতিতাদের জুতো পরা সমাজে নিষিদ্ধ। মনে হলো এই পদযুগলের জন্যই সেই গানের লাইন সৃষ্টি –'দিতে পারি এনে, ও রাঙা চরণে, আকাশের চাঁদ তারা সূর্য'। বিরতির ঘন্টা বাজলে তাকে আবার একবার দেখতে পাবো ভেবে হলের মধ্যে লাইট জ্বলে উঠলেই জোড়া জোড়া চোখ তার বসার জায়গাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু তাকে দেখা গেল না। মনে হয় বিরতির আগেই সে বেরিয়ে গেছে।

আমরা যারা জুলিয়াকে দেখেছি আর যারা দেখেনি তাদের মধ্যে অভিজ্ঞতার বিস্তর ফারাক। আমরা অফ পিরিয়ডে বসে জুলিয়ার রূপ বর্ণনা করতাম আর ওরা হা করে বসে গিলতো। আরও কতো কথা রূপকথা জুলিয়াকে ঘিরে। কেউ বলতো জুলিয়ার শরীরে নীল রক্ত বলে ও অতো অহংকারী। আমাদের ক্লাসে পৌরনীতিতে তুখোড় সাহাবুদ্দিন অবশ্য বলতো জুলিয়া নাকি লর্ড কর্নওয়ালিসের বংশধর। ঢাকা চট্টগ্রাম থেকে আসা ধনী অভিজাত ছাড়া ও কাউকে গ্রাহ্য করতো না। ওর নাকি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আর হিরে জহরতে দশটি সিন্দুক বোঝাই। একবার হায়দ্রাবাদের এক নিজাম নাকি একরাতের জন্য একাই তাকে লাখ টাকা দিয়ে গিয়েছিল। কোন এক রাতে জুলিয়াকে নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে গোলাগুলিতে বেশ্যালয়ের মধ্যেই একজন গ্রাহক মারা যায় এবং একজনের ডানহাত কাটা পড়ে। পরে হাতকাটা দুলালকে আমরা রাস্তাঘাটে দেখলে যে যেদিকে পারি দৌড়ে পলাতাম। অনেকে বলতো এ দুলাল সে দুলাল নয়। এর হাত মুক্তিযুদ্ধের পর কী কারণে যেন মুক্তিযোদ্ধারা কেটে দিয়েছিল।

কলেজ পাশ করার পর থেকেই ঢাকায় লেখাপড়া, বিয়ে, চাকরি, সন্তান, সংসার। তবুও নিজের মফস্বল শহর, নিজের বেড়ে ওঠা বাড়ি, গলির শ্যাওলাজমা সরুপথ, আঞ্চলিক ভাষার মমতা, লাল রেলব্রিজের স্মৃতিময় ঢাল, এক পর্যায়ে থেমে যাওয়া পড়া-শুনার স্থানীয় বন্ধুরা, কলেজের আমবাগান, রথতলা ইত্যোকার আকর্ষণ আমাকে বছরে একবার হলেও টেনে নিয়ে যায় আমার বর্তমান থেকে অতীতের সুবাসিত বলয়ে। একবার গিয়ে শুনলাম আমাদের মফস্বলের সেই বিখ্যাত বেশ্যালয় সে অঞ্চলের এম পি জামাত নেতা মালেক মুমিনের নির্দেশে ভেঙে ফেলা হয়েছে। ওই জমিতে এমপি সাহেব তার ভোকেশনল ট্রেনিং সেন্টার-এর উদ্বোধন করেছেন। ওখানকার মেয়েরা সব কে কোথায় গেল? আর সেই জুলিয়া?

কিন্তু জুলিয়া আমাদের গ্রামে কেন? না কি ও অন্য কেউ? নাকি জুলিয়া বলে আসলে কাউকে কোনদিন দেখিইনি, সিনেমা হলের দেখাটা একটা কল্পনা? জুলিয়াকে মানসপটে যেভাবে এঁকে রেখেছিলাম সেভাবে দেখার বাসনায় একটা আষাঢ়ে গল্পের অবতারণা করেছিলাম? না কি অন্য কারো দেখা গল্পকে নিজের মতো বানিয়ে নিয়েছিলাম? কিংবা জুলিয়া বলে আদৌ কোনকালে কেউ ছিল না, কেবল একটি জনশ্রুতি?

যাহোক, স্টেশনে পৌঁছে জানা গেল ট্রেন যথারীতি লেট। আমার স্কুল শিক্ষক বিধবা বড়বোন স্টেশন পর্যন্ত আমাকে তুলে দিতে এসেছে। আমি কৌতুহল দমন না করতে পেরে জিজ্ঞাসা করলাম–

'বুবু বুড়িটা কে?'

'কে আর। ছেলেপিলে যা বলে ডাকছিল তাই'

'ওকে কে আনলো আমাদের গ্রামে?'

'মানুচাচা'।

মানুচাচা আমার আব্বার চাচাতো ভাই। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার ভূমিকা ছিল খুবই বিতর্কিত। অনেকে বলে সে নাকি এম পি মালেক মুমিনের ডানহাত। গ্রামে সবচে বড় বাড়িটা এখন মানুচাচার। আমি গ্রামে এলে প্রতিবারই মানুচাচার বাড়িতে দাওয়াত থাকে। আব্বা পছন্দ করেন না। কিন্তু আমি কেবল চাচীর জন্য যাই। চাচীর আন্তরিকতাকে অগ্রাহ্য করার মতো মনোবল পাই না। এখনও চাচীর পাশে বসলে আমি তার গায়ে পান-দোক্তার গন্ধ পাই। চাচীর হাতের মুরগী রান্না আর বেগুন-বড়ির নিরামিষ না খেয়ে আমি কখনও গ্রাম ছাড়ি না। এবার গিয়ে চাচীকে পেলাম না। চাচী নাকি ছ'মাস আগে খুলনায় মেজ ছেলের বাসায় চলে গেছেন। গ্রাম ছেড়ে কোথাও থাকার মানুষ তিনি নন। কিন্তু কী কারণে যেন অভিমান করে তিনি গ্রামে আসছেন না। মানুচাচা দু'বার আনতে গিয়েছিলেন। তিনি বলে দিয়েছেন সেই আগের মাটির ঘর, উঠোন, গোয়াল-বাড়ি, ঢেঁকিঘর আর খড়ের চালের হেঁশেল ফিরিয়ে দিলে তিনি আসবেন। কিন্তু মানুচাচা সেসব ভেঙেচুরে দলান তুলেছেন। এখন আর তা সম্ভব নয়। এমন নির্বোধ মেয়েমানুষ তিনি জীবনে দেখেননি।

'চাচীতো অনেক সম্মানীয় ঘরের মেয়ে। মানুচাচার এসব বেচাল দেখেই কেটে পড়েছেন'–বুবু আপনমনেই বললো।

'বুড়িটাকে কদ্দিন হলো গ্রামে এনেছেন? কোথায় থাকে সে?'

'পাড়াটা ভেঙে দেবার পর। তা হয়ে গেল সাত আট বছর মতো। খেপারচরে চাচার যে আম বাগান আছে সেখানে ঘর তুলে দিয়েছেন'

'আব্বা এই জন্যে মানুচাচার সাথে কোন সম্পর্ক রাখেননা?

'শুধু আব্বা কেন? চাচার দুই ছেলেও আর গ্রামে আসে না। কেবল ছোটটি হয়েছে মন-মানসিকতায় মানুচাচার মতোই। মানুচাচার কারবার সে-ই দেখাশুনা করে'।

কিন্তু আমি জুলিয়াকে মন থেকে তাড়াতে পারছিলাম না। সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জুলিয়া কিনা আজ আমাদের গ্রামে নাম পরিচয়হীন বেশ্যা হয়ে ছেঁড়া শাড়ি পরে ছেলেপিলের কৌতুকের শিকার? এতো ধনসম্পদের অধিকারী হয়েও সে কি অন্যকোন অঞ্চলে চলে গিয়ে নিজের মতো বাস করতে পারতো না? কতই বা বয়স হবে জুলিয়ার? বড়জোর ষাট পয়ষট্টি। এ বয়েসেই ওরকম মাজাভাঙা থুত্থুরে বুড়ি হয়ে গেল? নাকি ও অন্য কেউ? আবার কালিপ্রসন্ন সিংহ সময়ের উদাহরণ দিতে গিয়ে যে উক্তি করেছিলেন তা মনে পড়লো–'সময় হচ্ছে বেশ্যার যৌবন'। হতেও পারে ওরা তাড়াতাড়িই বুড়ি হয়ে যায়। বুবুকে জিজ্ঞাসা করলাম–

'ওর নাম জানো বুবু?'

'কে জানে? ওদের আবার নাম'।

বছর দেড়েক পর বুবু ফোন করে বললো বাবার শরীর খুবই খারাপ। তাছাড়া গ্রামে কী একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে বাবা আর মানুচাচার মধ্যে গণ্ডগোল। আমি ছেলেকে ওর বাবার জিম্মায় রেখে তড়িঘড়ি বাড়ি গেলাম। বাবাকে দেখে খুব রাগ করলাম। এতো শরীর খারাপ কিন্তু কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে ঢাকায় আসবেন না চিকিৎসার জন্য। আমি কোনকিছু না শুনেই খানিক বকবক করলাম–এ বয়েসে শরিকদের সাথে ঝগড়াঝাটির দরকারটা কী? আমরা দুটোই মাত্র বোন। মা তো কবেই গত হয়েছেন। নানার তরফ থেকে পাওয়া মায়ের সম্পত্তির সবটুকুই বিধবা বুবুকে লিখে দিয়েছেন মা। ছেলে নেই বলে বাবার সম্পত্তি মানুচাচার ছেলেরাও পাবে। তাতে কী? আমরা দুবোন তো ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। ওরা যা পাবে নিয়ে নিক। বুবুকে এসব বলতেই বুবু পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে বললো–

'খামোখা চেচাচ্ছিস কেন? জমাজমির ব্যাপার না। ঘটনাটা বাজে।'

মানুচাচার সেই মহিলা মারা গেছে গত বুধবার। আমাদের গ্রামের একমাত্র ভিক্ষুক ফ্যালানির মা'র সেদিন কী ব্যস্ততা! ফ্যালানির মা-ই প্রথম বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবরটা চাউর করে এই বলে–'শোনোগো ভালোমানুষির বউঝি'রা, খেপারচরে বেশ্যি মরে, উঃ কী গোন্দো!' গ্রামের ছোটছোট দুরন্ত ছেলেরা ফ্যালানির মা'র প্রচারিত এ সংবাদ মুখে নিয়ে ছড়া কাটতে কাটতে খেপারচরে উপস্থিত হয়। বাড়িটার আসে পাশে মানুষজন জড়ো হতে শুরু করেছিল। সবারই নাকে কাপড়। ক'দিনের মড়া কে জানে? মানুচাচা যাওয়ার আগে সবাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল–

'পাপ ছাড়েনা বাপকে। এর থেকে মুক্তি আছে?'

'মরার আগে মুখে পানিও পায়নি বোধহয়'

'দেখোগে এতক্ষণে শেয়াল কুকুরের ভক্ষণে লেগেছে কি না'

'আরে এদের মরা শেয়াল-কুকুরেও খায় না'।

এরপর মানুচাচা তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হাজির হলে মানুষজন তাদের পিছেপিছে বুড়ির ঘরের মধ্যে ঢোকে। মেঝেতে মাদুরের ওপর একদিকে কাত হয়ে মরে থাকা কুজো নারীকে অর্ধচন্দ্রের মতো দেখাচ্ছিল। ফুলে ফেঁপে ওঠা শাদা চামড়া দিয়ে যেন জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছিল। কুঁচিয়ে রাখা শাড়ির ভাঁজের মতো চামড়া টান টান হয়ে মসৃণ মসলিনে রূপান্তরিত হয়েছিল। কোমরে পেঁচানো চাবি-ঝুলানো ডোর পেট কেটে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। ছোট ছোট পোকা আর কালো পিঁপড়ে মেঝেতে লেগে থাকা শরীর থেকে নির্গত রসের চারিদিকে আউটলাইন রচনা করছিল। শুঁড়আলা বাদামি পোকারা পড়ে থাকা হাতকে কাঠের গুঁড়ির মতো ফুঁটো করে করে ঢুকছিল আর বেরোচ্ছিল। একটা খোলা হাড়িতে পচা পান্তার উপর বুদবুদগুলো একা একাই অস্থির হচ্ছিল। সারি দেয়া পাঁচটা সিন্দুকের একেকটাতে চারটে করে তালা দেয়া। মানুচাচার নির্দেশে নাকে গামছা পেঁচিয়ে একজন কামলা মৃতার কোমরে ধারালো কাস্তে ঠেকিয়ে কোমরের ডোর কাটতে গেল। কাস্তের আগা অনায়াসে খানিকটা জমাট দুধের পায়েসের মতো শরীরের মধ্যে ঢুকে গেলে আবার টেনে বের করে এনে তা কাটা হলো। মৃত শরীর তবুও দর্শকরা কেউ কেউ আহা উহু করে উঠলো। ঝনঝন করে পুরোনো জংধরা প্রায় চল্লিশ-পয়তাল্লিশটা চাবি মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়লো। সবার সামনেই মানুচাচা সিন্দুক খোলার হুকুম দিলেন। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে সিন্দুক খোলার অপেক্ষায় লাশের গন্ধের মধ্যেও ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকলো। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার প্রচেষ্টা চালিয়েও কোন চাবিতেই তালাগুলো খুললো না। মানুচাচা তালা ভাঙার হুকুম দিলেন। দর্শকরা হর্ষধ্বনি করে উঠলো। তালাগুলো ভাঙতে খুব জোরের প্রয়োজন হলো না। ঠুক ঠুক করে সাধারণ দা দিয়ে বাড়ি দিতেই সব ভেঙে পড়লো। দর্শকরা লাশ এবং তীব্র গন্ধ উপেক্ষা করে সিন্দুকগুলোর ওপর ভেঙে পড়লো। সবার উত্তেজিত মুখ আর বিস্ফোরিত চোখ নিমেষেই ম্রিয়মাণ হয়ে পূর্বাবৎ সাধারণ অবস্থায় ফিরে এলো। সিন্দুকগুলোর কোনটার মধ্যেই কিছু নেই। কেবল একটাতে লাল জরির পাড় বসানো একটা রুমাল রাজ্যের ধুলোর মধ্যে পড়ে ছিল। রুমালটা একবার তুলে ধরে আবার সেখানেই রেখে সব সিন্দুকের ডালা বন্ধ করে দেয়া হলো। গ্রামের লোকজন যারা এতদিন মানুচাচাকে খেপারচরের বেশ্যাকে ধনদৌলতের লোভে আশ্রয় দেয়ার জন্য শাপ শাপান্ত করতো তারা মুহূর্তে মত পাল্টে ফেললো। জনদরদী মানুচাচার ভাষ্যের মতোই তাদেরও মনে হলো একজন আশ্রয়হীন অসহায় বৃদ্ধাকে আশ্রয় দেয়া ছাড়া তার আর কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। কামলাদের হাতে টাকা ধরিয়ে দিয়ে মানুচাচা বলে গেলেন–

'লাশ কবর দেয়ার কোন দরকার নেই। মাদুরে পেঁচিয়ে গরুর গাড়িতে তুলে মাথাভাঙা নদীতে ফেলে দিয়ে আয়। এসব লাশ গ্রামের মাটির তলায় রেখে দিলে গ্রামের ওপর আল্লার গজব নাজিল হবে'। মানুষজন মানুচাচার ধার্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে গেল।

বুবু বললো–

'অশান্তিটা ওখান থেকেই। আব্বা শুনে বলে দিল লাশ নদীতে ফেলা যাবে না। মানুর আমবাগানের এক কোণায় কবর দিতে হবে। কারণ মানুই তাকে এ গ্রামে এনেছে। ব্যাস্ লেগে গেল। অধিকাংশ মানুষই মানুচাচার দলে। তারা মানুচাচার যুক্তির সাথে একমত। আব্বা যখন নাছোড়বান্দা তখন মানুচাচা অপমানের অস্ত্র নিক্ষেপ করলো–এতো দরদ কেন আপনার? তাহলে কি ধরে নেবো সিন্দুকের ধন সব আপনার ঘরে?'

তারপর থেকেই আব্বা বিছানায় পড়ে। লাশ নদীতেই ভাসানো হয়েছে। আমি কোন কথা শুনতে নারাজ। আব্বা যদি আমার সাথে ঢাকা না যান তবে আমি গ্রামের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেব। জীবনে আসবো না বলে দেয়াতে যুদ্ধে পর্যুদস্ত গররাজি আব্বা শেষপর্যন্ত রাজি হলেন। আসলে অপমানে আব্বা মানসিকভাবে ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন বোঝা যাচ্ছিল। বুবুকেও সাথে নিয়ে আব্বাকে খুব সাবধানে স্টেশনে আনা হলো। স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ঢোকা যাচ্ছিল না। উপচেপড়া ভিড়। মানুচাচার ছোটছেলে নতুন বিয়ে করা বউ দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে খুলনায় চাচীর কাছে। আমরা ঢোকার চেষ্টা করলে মানুষজন সরে দাঁড়ালো। নতুন বউয়ের মুখের দিকে চোখ পড়তেই আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। জুলিয়া! সেই চেহারা। সেই বসার রাজকীয় ভঙ্গী। বিষণ্ন সৌন্দর্য। চোখের পাশে কালো তিল। গা ভর্তি পুরোনো ডিজাইনের পাথর বসানো সোনার গয়না। চুমকি-জরির ভারি বেনারসি শাড়ির ছড়ানো পাড়ের নিচে পা দেখা গেল না।

ওদের ট্রেন আসার সংকেত শুনে মানুচাচার ছোট ছেলে ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করে আমাদের সালাম দিল। আমার নির্বাক আব্বাকে দেখিয়ে বউকে সালাম করতে বললো। বউ সালাম শেষ করে উঠে দাঁড়ালে তার হাতে ধরা জরির পাড় বসানো খুব পুরোনো একটা লাল রুমাল খসে পড়লো। মানুচাচার ছেলে আব্বাকে বাম হাত দিয়ে সালাম করলো কেন বুবুকে পরে জিজ্ঞাসা করলে ও বললো–

'কেন জানিস না, ওর ডান হাত কাটা।'

রাজধানীর রাত

পাঁচদিনের টাইট সিডিউল শেষ করতে গিয়ে এবার দিল্লি ঘোরা হলো না। সকাল সাড়ে আটটা থেকে সন্ধ্যে পৌনে সাতটা পর্যন্ত ওয়াইডব্লিউসিএ-র কন্‌ফারেন্স কক্ষে কথা আর কথা। ব্রেকে কফির সাথে অমুক পাকোড়া, তমুক পাকোড়া। লাঞ্চে দক্ষিনী গদগদে মশলার সাথে চিকেন আর পনির। রাজধানী এক্সপ্রেসে উঠে মনে হলো ঢাকা ফিরে প্রথমেই ইলিশের মাথো মাখো ঝোল দিয়ে আগে একথালা সাঁটবো। ঢের হয়েছে বাবা পালকপনির। বিরক্তির একশেষ। সামনের টায়ারে বসা যুবকটি বসতে না বসতেই হেডপ্যাডে মাথা দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো। কফি এসে গেল রাজধানী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

আমি আর আমার কলিগ তুপা নিজেদের মধ্যে সেমিনারের টুকিটাকি নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগলাম। সেমিনারে কিচেন ব্যবস্থাপক উড়িষ্যার এক ভদ্রলোক 'হ্যাপি' উচ্চারণ করতে গিয়ে বারবার 'আপি' বলছিলেন। তুপা প্রথমে ভেবেছিল ওকে বুঝি আদর করে আপি ডাকছে। এ নিয়ে হাসতে হাসতে বিস্কুট ডুবিয়ে কফিতে জম্পেস চুমুক দিতে গেলাম। এ্যাহ্ ! একেবারে ঠাণ্ডা। তুপা ওয়াক করে উঠলো। সামনের টায়ারে বসা তাঁতের শাড়িপরা বয়স্কা এক নারী তার ঘাড়ের ওপর ঢলে পড়া চোখ বুজে থাকা সুদর্শন যুবকটিকে মোলায়েম আদরে মাথায় হাত বুলিয়ে ডেকে তুলে কফির কাপ এগিয়ে দিলেন। কোমল গলায় বাংলায় বললেন–

'বল্টু, নে ধর, কফি খা'।

বল্টু যেন চাইছিল ভদ্রমহিলা ওর মুখের সামনে কাপটা ধরুক। ও কেবল চুমুক দেবে। চোখ বন্ধ করেই ক্লান্ত হাত বাড়িয়ে ঈষদুষ্ণ কফি প্রায় একঢোকেই গলধঃকরণ করলো বল্টু। তুপার মতো ওয়াক করলো না বা মুখেও বিস্বাদ ফুটে উঠলো না। ওরা বোধহয় প্রায়শই রাজধানীতে যাতায়াত করে এবং এই কফির সাথে কোন বিরোধ বোধ করে না। কফির খালি কাপ ভদ্রমহিলার হাতে দিয়ে আবার কাঁধে মাথা রাখলো যুবক।

বামপাশের টায়ারে এক নববিবাহিত দম্পতি হয় হানিমুন অথবা কোথাও ভ্রমণে যাচ্ছে। স্বামীটা এদিক ওদিক তাকিয়ে একবার বউটার সিটের ওপর তুলে রাখা নগ্ন পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, একবার হাত ধরে চুড়ি নিয়ে খেলা করছে। লক্ষ করলাম বউটি আমাদের দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসছে আর স্বামীকে চোখে কপট শাসন করছে। ফেমিনায় চোখ বুলাচ্ছিলাম আমি আর তুপা। সবার অমনোযোগের সুযোগে স্বামীর দুষ্টুমিতে বউটার 'উঃ' শব্দে বল্টুও তাকালো। স্বামী কানে কানে কথা বলতে গিয়ে বউটার কানে কুটুস করে কামড়ে দিয়েছে। এবার বল্টুর ভ্রূর মাঝে ভাঁজ পড়লো। এতক্ষণে বল্টু বললো–

'মা, আমার টায়ারে বিছানা করে দাও। আমি ঘুমুবো।'

'রাতের খাবার আসছে। একবারে খেয়েই ঘুমো বাবা।'

তুপা পা উঠিয়ে আরাম করে বসার জন্য পা লম্বা করতেই ভদ্রমহিলার পায়ে পা লাগলো। তুপা 'সরি মাসিমা' বলে স্বভাবজাতভাবেই ভদ্রমহিলার গায়ে আলতো করে হাত লাগিয়ে হাতের আঙুল ঠোঁটে ছুঁয়ে চুক করে শব্দ করলো। মাসিমা বললেন–

'না না ওতে আর কী? তা তোমরা বুঝি কোলকাতা ফিরছো?'

'না ঠিক কোলকাতা না। কোলকাতা হয়ে ঢাকা। আমরা বাংলাদেশের।' বললাম আমি।

বল্টু আর ওর মা হঠাৎ অবাক বিস্ময়ে আমাদের দিকে তাকালেন। ওরা আর একবার যেন ভালো করে সালোয়ার কামিজ গলায় ওড়না তোলা আমাকে আর শার্ট-প্যান্ট পরা তুপাকে নতুন করে লক্ষ্য করলেন। বিস্মিত চোখেই মাসিমা দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করলেন–

'নাম কী মা তোমাদের?'

তুপা বললো–

'আমি তুপা আর ও খুকু'।

মা ও ছেলে একে অন্যের দিকে তাকালেন। ওদের চাউনি এবং প্রশ্নতেই আমি বুঝে ফেললাম ওরা ঠিক ঠাহর করতে পারছেন না আমরা হিন্দু না মুসলমান। নামও তো গোলমেলে। আমাদের আলাপের সুযোগে ওদিকের স্বামীটা আবার বেপরওয়া হয়ে বউটার কোলে মাথা দিয়ে ফেলেছে। বউটা স্বামীর চুল ধরে টানছে।

বল্টু আবার চোখ বুজে পেছনে মাথা ঠেকালো। মাসিমা আমতা আমতা করে আবার জিজ্ঞাসা করলেন–

'পদবী কী?'

আমি এ প্রশ্ন আসার কেবল অপেক্ষা করছিলাম। মনে মনে আমাদের বাবাদের নাম আবৃত্তি করে মুখে বলে দিলাম–

'তুপা হলো গিয়ে সরকার, আমি বিশ্বাস।'

'অ। তাই বলো।' কেমন স্বস্তির নিশ্বাস।

'আমি ভাবছিলাম বাংলাদেশের যখন তখন মুসলিম। কিন্তু তোমাদের পোশাকে-আশাকে তা মনে হচ্ছিল না।'

আমাদের প্রতিবাদ করার আগেই বল্টু চোখ বন্ধ করে নির্লিপ্ত কণ্ঠে এই প্রথম আমাদের আলাপের সাথে গলা মিলালো–

'তসলিমা নাসরিনের দেশের মেয়েদের এতো মৌলভি ভাবার কী আছে মা?'

'না, না ওরা হলো গিয়ে...'

মাসিমা শেষ না করতেই তুপার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল–

'আমাদের দেশে এসব পদবী মুসলমানদেরও হয়। আমরাও তাই'।

বল্টু যেন একটুও আশ্চর্য হলো না। মাসিমা নড়ে চড়ে আবার আমাদের ভালো করে দেখতে লাগলেন।

'বাংলাদেশের মুসলিম মেয়েরা তো জানি মাথা ঢেকে রাখে। ঘরের বাইরে বের হয় না। ওরা কি আজকাল ইউনিভার্সিটিতেও পড়ছে? চাকরি-বাকরিও করছে?'–মাসিমার অবাক জিজ্ঞাসা।

'আমরা দুজনেই একটা ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশনে কাজ করি। আমাদের দেখলে কি তাই মনে হচ্ছে মাসিমা?'–তুপা জিনসের নিচের দিকটা খানিক গুটাতে গুটাতে বললো।

'আমি ইটালিতে একজন বাংলাদেশি মেয়ের সাথে কাজ করেছি মা। তোমাকে বলিনি?'

ছেলের কথার উত্তর দিয়ে মাসিমা বললেন–'কই নাতো। কিন্তু তোমাদের দেখে ভারি ভালো লাগছে।'

দেখতে দেখতেই রাতের খাবার চলে এলো। আমরা নিলাম ভাত মাছ মুরগী। বল্টু কন্টিনেন্টাল। মাসিমা নিরামিষ। বামের নবজোড়া আবার আদিখ্যেতা শুরু করেছে। স্বামী চোখ বুজে হা করে আছে। বউটা স্বামীর মুখে ডাল মাখিয়ে দোসা ছিঁড়ে তুলে দিতে গিয়ে নিজেই গপ করে খেয়ে ফেলে হেসে কুটিকুটি। আবার খুনসুটি। বল্টু খানিক বিরক্ত।

'তসলিমা কি একটু বাড়াবাড়ি করছেন না? ওয়োম্যান লিব মানে কি প্রচলিত কোনকিছুই না মানা? প্রথার মধ্যে কেবল খারাপটাই আছে?'

তুপা ওর সাবজেক্ট পেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠলো। মাসিমাকে দেখেই খুব আধুনিক মনে হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে উচ্চশিক্ষিতও। আমি মাসিমার সাথে একটু একমত পোষণ করলেও তুপা হা হা করে উঠলো–

'কিন্তু কাউকে না কাউকে তো উচ্চকণ্ঠ হতেই হবে। প্রথাতো সব পুরুষের দিকে। নিজেদের সুবিধাগুলোকে জাস্টিফাই করার জন্যেই প্রথার জন্ম। তসলিমা হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট'।

'না না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমি তসলিমাকে সমর্থন করি। নারীর বঞ্চনার কথা এমন করে কে কবে বলতে পেরেছে? কিন্তু তসলিমা সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে যেটা বলছেন বা করছেন তা সামাজিক নারীরা করতে গেলেই বিপত্তি হচ্ছে। একজন নারী তো একা একা চলতে পারেন না'

মাসিমাকে একপ্রকার ধমক দিয়েই থামিয়ে দিয়ে বল্টু তুপার দিকে তাকিয়ে বললো–

'তসলিমাকে আজ হয়তো একা লড়াই করতে হচ্ছে। কিন্তু ভবিষ্যতের নারীদের মধ্যে তা স্লো পয়জনের মতো ছড়িয়ে পড়লে একদিন এ লড়াই সার্থক হবে। নারীকে মুক্ত করতে হলে নারীদের মধ্যে থেকেই প্রতিবাদ আসতে হবে। আজকের নারী বাইরে কাজে বেরুচ্ছেন। দিনের কাজ শেষে ঘরে ঢুকে তিনি কেন একা সংসারের দায়িত্ব নেবেন? প্রথা মানতে গেলে নারীর ওপর দ্বিগুণ বোঝা চাপানো হচ্ছে না?'

'দেখুন দেখুন আপনি পুরুষ হয়েও যেটা বুঝছেন মাসিমা কিন্তু একজন আধুনিক নারী হয়েও সেই ঘূর্ণাবর্ত থেকে বেরুতে ভয় পাচ্ছেন।'–তুপা সমর্থক পেয়ে প্রগলভ হয়ে পড়লো।

'আমি কিন্তু ভালো আর মন্দের কথা তুলছি'–আমি গলা শান্ত রেখেই বললাম–

'আজকের দিনে গৃহকর্মে নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ আসতেই হবে। কিন্তু পুরুষ পলিগ্যামি করলে প্রথা ভেঙে নারীও তাই করবেন তাহলে নারী উত্তম থাকতে পারলেন কোথায়? মর্যাদাবোধ তো নারী-পুরুষ উভয়েরই থাকতে হবে। বরং নারীকে প্রচলিত সমাজের অনাচার রোধে এমন উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে যাতে পুরুষকুল নিজকে শুধরাতে সচেষ্ট হয়।'

তুপা ক্ষেপে উঠলো–

'তাহলে পতিকে পরমেশ্বর বলে মাথায় তুলে রাখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করলেই আর কোন ঝামেলা থাকে না।'

'তসলিমা শুরু করেছেন। পরিবর্তন আসতেই হবে। নারী এভাবে আর কতো পড়ে পড়ে মার খাবেন? আমাদের পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তন এক্ষেত্রে খুবই জরুরি। আমি মনে করি নারী একা এ যুদ্ধে জিততে হলে সময় লাগবে। সমমানসিকতার পুরষদেরও পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। আমি আশাবাদী। আপনাদের দেখে আমি খুবই ইমপ্রেসড।' –বলে বল্টু পা উঠিয়ে বসলো।

মাসিমা চোখ বুজলেন। মেঘ না জমেও হঠাৎ দমকা হাওয়ায় যেমন সাজানো বাগান দুমড়ে মুচড়ে যায় তেমনি মাসিমার মুখের ওপর বলিরেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে শান্ত সমাহিত ভাবটা বিঘ্নিত হলো। তিনি তর্ক করাটা বাহুল্যবোধ করলেন। বরং উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ওপরের টায়ারে চাদর বিছিয়ে বালিশ ঠিক করে দিলেন। বল্টু আরো কিছু বলতে গিয়েও মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কেন জানি নিরব হয়ে গেল। ইশারায় কী একটা চাইলো। মাসিমা বুঝে নিয়ে ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করে ছেলের হাতে দিলেন। টুথব্রাশ বের করে পেস্টও লাগিয়ে দিলেন। বল্টুর স্যান্ডেল ট্রেনের দুলুনিতে আমাদের টায়ারের নিচে এসে গিয়েছিল। মাসিমা নিচু হয়ে তা বের করতে গেলে বল্টুই থামিয়ে দিয়ে পা দিয়ে কোনমতে টেনে এনে পা গলিয়ে অলস ভঙ্গীতে টয়লেটের দিকে চলে গেল। যেতে যেতে বাপাশের টায়ারে বউয়ের কোল আঁকড়ে শুয়ে থাকা লোকটার দিকে বিরক্তির চোখে তাকালো। বউটি স্বামীর চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিল।

তুপা আপনমনে বকবক করতে করতে শোবার জোগাড় করছিল।

'মাসিমা আপনার মা জন্ম সার্থক। চমৎকার ছেলে আপনার। এরকম ছেলে ঘরে ঘরে জন্মালেই না আমরা মেয়েরা সংগ্রামের পথে সহযাত্রী পাবো। ধন্য মা আপনি'।

যাব্বাবা, তুপাটা কি বল্টুর প্রেমে পড়ে গেল নাকি? এতদিনে বোধহয় তুপা একজন সমমনা খুজে পেয়েছে। আমি আড় চোখে তুপার গদগদ মুখটার দিকে তাকাতেই দেখলাম তুপা হোল্ডারে পা বাঁধিয়ে ওপরের টায়ারে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। তুপার খানিক বিস্মিত চোখের দিকে তাকাতেই ওর চোখ অনুসরণে বাধ্য হলাম। চোখ গিয়ে আটকে গেল মাসিমার চোখের নিচে। যেখানে ক্ষীণধারায় নেমে আসছিল অব্যক্ত বেদনার জলরেখা। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে দুজন ওর দুপাশে গিয়ে বসলাম। তুপা মাসিমার ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়ে একটু বুকের দিকে টেনে নিল। আমি হাত ধরে নিবিড় সহানুভূতির প্রত্যয় ব্যক্ত করলাম। মাসিমার শরীরের কাঁপন শব্দহীন কান্নাকে যেন আরো তীব্র করলো। আমরা কেউই কোন প্রশ্ন করলাম না। মাসিমা আঁচল টেনে চোখ মুছেই বললেন–

'আমাদের জীবনের একটা অধ্যায় শেষ করে এলাম। আসলে আর টেনে নেয়া যাচ্ছিল না। যাবে কীভাবে? ওরা দুজন যে যার জায়গায় অনড়। মাঝখান থেকে আমার বুকের মানিককে...'

মাসিমাকে কাঁদতে দিলাম আমরা। তুপা উৎসুক। ওপাশের বউটার স্বামীর মাথায় হাত থেমে আছে। বাংলা বুঝতে না পেরে চোখে কৌতুহলের ঢেউ।

'আমি বউ-এর কোন দোষ দেইনা। দুজনেই হাইলি কোয়ালিফাইড। ইকোনমিস্ট। পিএইচডি শেষ করে বিয়ে করলো। আইএমএফ-এ চাকরির সুবাদে ওরা তিনবছর ইটালি ছিল। ওরই মধ্যে মেয়ে হলো। বিহুকে আমিই মানুষ করেছি। একদিনের জন্যও ওকে ছেড়ে থাকিনি। আজ চলে আসার সময় ঐ সাড়ে তিন বছরের মেয়ে যখন বললো– ঠাম্মা, তোমার গায়ের গন্ধ ছাড়া আমার ঘুম আসবে না। তুমি যেও না। বাবাকে বলো মায়ের সাথে ভাব করে নেবে। আমি কী বলবো? আমি কি ওদের মতো করে বুঝি?'

তুপা মুখ খুললো–

'একেবারে ডিভোর্স?'

'হ্যাঁ মা। খুবই বাজেভাবে শেষ হলো। আরো আগে সিদ্ধান্ত নিলেই ভালো হতো। অতটা ঘটতো না।'

কী ঘটেছে, কতোখানি আমাদের কৌতুহল গলা অব্দি উঠে এলেও মুখে প্রশ্ন এলো না।

মাসিমা নিজেই বলতে লাগলেন–'ইটালি থেকে এসে একবছরের মাথায় অফিসে কী যেন হলো, বল্টু চাকরি ছেড়ে দিল। ছেলেটা আমার ছোটবেলা থেকেই একটু রগচটা। ওর মতের বাইরে কিছু করা যাবে ন। শ্রেয়া মানে আমার বউমা চাকরি করতে লাগলো। বল্টু বাসায় বসে কেবল পড়ে আর কম্পিউটারে কাজ করে। বিহুকে একটা ইস্কুলে দেয়া হয়েছে। আমিই আনা নেয়া করি। কাঁচা বাজারটা পর্যন্ত বউমাকে করতে হয়। বউমা অপিসে থাকলে মাঝেমধ্যে মুখে তুলে খাইয়েও দেই খোকাকে। হয়তো আমারই দোষ, আমিই হয়তো ওকে পরনির্ভরশীল করে গড়ে তুলেছি। কিন্তু শ্রেয়ার এটা ভালো লাগতো না। চাকরি বাকরি নেই তো ঠিক আছে, আজ নেই কাল হবে, কিন্তু বাজার ঘাট, বিহুর ইস্কুল, ঘরের কাজ তো করা যায়। শ্রেয়াকে এসেই মেয়ে নিয়ে বসতে হতো। বল্টু তখন হয় টিভিতে খেলা দেখছে নয় বইয়ে ডুবে আছে। এভাবে তো আর দিনের পর দিন যায় না। আমার ছেলে, আমি নাহয় ওর সব আলসেমি সহ্য করি। কিন্তু পরের মেয়ে একা চাকরি করে এসব কতোদিন সহ্য করবে? একদিন বিহুকে ইস্কুলে দিয়ে বাসায় এসে দেখি কাচের বাসনকোসন, শোপিস, ফুলদানি সব ঘরের মেঝেতে ভেঙে ছড়িয়ে আছে। বাসা একেবারে লণ্ডভণ্ড। খোকা কিছুই বললো না। পরে বউমার মুখে শুনেছি অফিস যাওয়ার সময় সে বল্টুকে বলেছিল এককাপ চা করে দিতে। তাতেই নাকি বল্টু অপমানে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল। শ্রেয়াও জানে বল্টুর মতো ট্যালেন্ট লাখে একটা। ওর হয়তো অনেকের সাথেই মেলে না। আপোস করার মতো ছেলে ও নয়। কিন্তু শ্রেয়া ওকে চাকরির জন্য রোজ পীড়াপীড়ি করে। একটু কম স্যালারি হলেও কোথাও ঢুকে পড়তে বলে। বল্টুর এক গোঁ। চেষ্টা করছি। আগেরটার চেয়ে ভালো না পাওয়া পর্যন্ত কোথাও ঢুকছি না। ব্যস, একটু একটু করে বাড়তে থাকলো গণ্ডগোল। তারপর যা হবার..। আমি মা, আমি তো বুঝি, বিহুর জন্য খোকার ভেতরটায় কী হচ্ছে!'

মাসিমার চোখ মুছিয়ে বল্টু আসার আগেই আমি আর তুপা নিজেদের টায়ারে উঠে এলাম। বল্টু ভেজা তোয়ালে, ব্রাশ, রেজার মায়ের কোলের ওপর ঝপ করে ফেলে ওপরের টায়ারে চলে গেল। আমার ট্রেনে বাসে একদম ঘুম হয় না। তুপা ওপরে আদৌ ঘুমালো কি না কে জানে। আমি ঘুমহীন চোখে মা আর ছেলেকে সারারাত দেখলাম। ওরা কেউ ঘুমোয়নি। একসময় বল্টু ওপর থেকে নেমে এসে মায়ের ঘাড়ে মাথা দিয়ে চোখ বুজে ছিল। প্রয়োন্ধকারে মাসিমার থিরথির করে কাঁপা শরীরে কান্নার নিরব আওয়াজ পেয়ে বল্টু চোখ খুলে মায়ের চোখ মুছিয়ে দিল। আমি না দেখার ভান করে সব দেখলাম। সামান্য একটু ঝিমুনির পর ভোরের বেলা হাওড়া ব্রিজের কারুকাজ আলো ছায়ায় যে মুখ দুটো প্রথমেই নজরে পড়লো সে মুখে যেন লেগে ছিল শতাব্দীর ক্লান্তি। চোখে স্বপ্নহীন গন্তব্যের নিস্প্রভ আলো। সর্বস্ব হারানোর নির্বাক অভিব্যক্তি। তুপা নেমে এসে ব্যাগ গুছিয়ে ফেললো। মাসিমা নামার আগে বললেন–

'একবার বাংলাদেশে যাবো। বরিশালে আমার মামার বাড়ি'

'তাই? আপনি আসবেন মাসিমা। দেখবেন বাংলাদেশের মেয়েরা কতো এগিয়ে গেছে। আমার বিয়ের সময় আসবেন। আমার যে বর হবে সে আপনাদেরই সম্প্রদায়ের। কবি ও সাংবাদিক। কোন বড় চাকুরে না। আমরা হানিমুনে গোয়া যাবো ঠিক করে রেখেছি'–আমি বল্টু আর মাসিমাকে উদ্দেশ্য করে বললাম।

বল্টুর ওপর মনোক্ষুণ্ন তুপা কেবল মাসিমাকে বিদায় শুভেচ্ছা জানালেও আমি ভদ্রতার খাতিরে বল্টুকেও বাংলাদেশে আসতে বললাম। সেই নবদম্পতির স্বামী প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে হিন্দিতে বউকে কষে বকুনি দিচ্ছে দেখলাম। লোকজন না থাকলে চড়টড়ও বসিয়ে দিত মনে হয়। যা বুঝলাম তাতে মনে হলো বউটাকে এক ছোকরা ভিড়ের সুযোগে ধাক্কা দিয়েছে। কিন্তু তাতে যেন বউটার অসাবধানতাই দায়ী। ব্যাগ ঘাড়ে তুলে পেছন ফিরে হাত নাড়তে গিয়ে দেখলাম মাসিমা আর বল্টুর চোখে হতাশার সেই ছায়ার ওপর আস্তে আস্তে ডানা মেলছে বিস্ময়ের রোদ।

সেবিকা

সেদিন ঘরে ফিরতে গিয়ে গলির মুখে একটু থেমে পা বাড়াতে হয় কৃষ্ণাকে। ফিরতে একটু দেরি হওয়ায় গলির সরুপথে দিনের আলোকে দ্রুত দু'হাতে ঠেলছিল আঁধার। অকারণে গা ছমছম করছিল।

আগে দু'বেলা করালেই চলতো কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশে ইদানিং তিনবেলাই ব্যায়াম করানো লাগছে কর্তাবাবুকে। মাইনেও অবশ্য বাড়িয়েছে। কে জানে কৃষ্ণা মাইনে বাড়াতে বলাতেই প্যারালাইসিস কর্তার ব্যায়ামও দু'বেলা থেকে তিনবেলায় উত্তীর্ণ করা হয়েছে কি না। কর্তাবাবুর ছেলের বউটি ভারি ভালো। পুত্রবধুরা তো সাধারণত পঙ্গু শ্বশুর-শাশুড়ির ভার বইতে বিরক্তির একশেষ হয়। কৃষ্ণার শাশুড়ির কথাই ধরা যাক না। একটানা নয়দিন শাশুড়ির গু ঘাঁটতে ঘাঁটতে দশদিনের দিন কৃষ্ণা ঘরের বেড়ায় ঝুলানো পুরোনো ক্যালেন্ডারে দূর্গা মায়ের ছবির পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ভেঙে পড়েছিল–'ঠাকুর, হয় পায়ে ঠাঁই দাও না হলে ভালো করে দাও। আমি আর পারছিনে'। 'ভালো করে দাও' যে বলার জন্য বলা তা ঠাকুর শুনেছিল। দশদিনের দিন খাওয়া বন্ধ হলো। তার পর তিনদিন মুরগীর ঠ্যাংএর মতো শাশুড়ির সরু দুটি ঠ্যাং ডান হাতে উঁচু করে ধরে বাঁ হাতে খবরের কাগজের টুকরো নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চোখ বন্ধ করে আর শাশুড়ির গু লেপটানো পাছা মুছে দেয়া লাগেনি। ও ক'দিন একবারে খটখটে। মুখে চামচের আগায় একফোঁটা করে জল দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু ওতে বিছানা ভেজায়নি। মরার পরে কৃষ্ণা জবজবে ভেজা বালিশ পেয়েছিল। কালঘাম ভেবে ও কিছুই মনে করেনি। শাশুড়ি মরে গেলে বুক উজাড় করে দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। সেটা বেশিরভাগই স্বস্তির হলেও কৃষ্ণা ক'দিন অপরাধবোধে ভুগেছিল। আহারে, বুড়িটাকে যদি আর একটু সেবা করতো তাহলে মনে কোন খেদ থাকতো না। সেই খেদ থেকেই কি না কে জানে কর্তাবাবুকে কেবল দায়সারা সেবা করছিল না সে। তাছাড়া মোটা মাইনের দায়বদ্ধতাও ছিল। কৃষ্ণা তো জীবনে ফাঁকিবাজি শেখেনি। যখন যে কাজটা ওর হাতে এসেছে তখন সেটা সুচারুভাবে না করতে পারলে অস্বস্তিতে ওর ঘুম হয় না। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। আর গায়ে-গতরে কৃষ্ণা তো আর কমজোরা নয়। প্রতিদিন সকালে কাজে বের হওয়ার সময় ও যখন ধোয়া কাপড় পরে, চুলের লম্বা বেণি নিয়ে টানটান করে খোপা বেঁধে, সন্ধ্যায় ডুবতে বসা ডালিম রঙের ডগডগে সূর্যটাকে কপালে বসিয়ে, কোমরে আঁচল গুঁজে, মুখে পোরা পানের খিলিতে একদিকের গাল ফুলিয়ে তরিৎ বস্তির গলি অতিক্রম করে তখন ডাইনে-বাঁয়ের ঘর থেকে শক্তসোমত্থ পুরুষগুলো লুকিয়ে ওর পাছার দুলুনি গিলে। কৃষ্ণা ওসব তোয়াক্কা করে না। বরং মুখব্যাদান করে এমনভাবে পানের পিক বস্তির নোংরা জল জমা জায়গাটাতে ছুঁড়ে দেয় যা দেখলে বুদ্ধিমান হোৎকাগুলো ঠিক বুঝে নেবে তার থুতু

কাদের উদ্দেশ্যে। ইচ্ছে করেই মুখের ভঙ্গি বিকৃত করে পান চিবুতে চিবুতে বের হয়। যাতে ওর সুডৌল মুখটা কারো চোখ আকর্ষণ না করে। ছোঁকছোঁক করা পুরুষের কাজ। নিজের কাজ একশভাগ সততার সাথে করাটাই ওর মাথায় ঘাঁই মারে। কাজ দেখে ভয় পেলে চলবে? সিজন ছাড়া যখন ঘরের মানুষটার কাজ থাকে না তখন তিনটে পেট তো কৃষ্ণাকেই চালাতে হয়। তবুও ভালো যে কাজ না থাকলেও তাদের এক বছরের একমাত্র আদরের মেয়ে ফুলকিকে দেখাশোনা ঠিকমতোই করে সে। মেয়েও বাবা বলতে অজ্ঞান। মেয়ের দেখভাল করাও তো কাজ। বর্ষার সিজন ছাড়া রাস্তা খোড়াখুড়ি শুরু হয় না। হলেই কাজে যাবে স্বামী। তখনতো মেয়ের দেখাশুনার জন্য কৃষ্ণাকেই কাজ ছেড়ে বাড়ি বসে থাকতে হবে ।

কর্তাবাবুর ডান পা আর ডান হাত অবশ মেরে গেছে স্ট্রোকে। তবে বাম হাত সচল। অনেকে বলে একহাত পড়ে গেলে নাকি দু'হাতের সব শক্তি একহাতে এসে ভর করে। একেবারে লিঙ্গমূল থেকে গোঁড়ালি অব্দি দু'হাতের তালু দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব্যায়াম করাতে হয়। একদিন বিকেলে ব্যায়াম করানোর সময় কৃষ্ণা ঠাং-এর গোড়ায় হাত দিতেই বাম হাত দিয়ে কৃষ্ণার হাত খপ করে ধরে নিজের লিঙ্গে চেপে ধরেছিল কর্তা। কৃষ্ণা তড়াং করে লাফিয়ে উঠে এক ঝটকায় একেবারে পায়ের পাতার কাছে গিয়ে বসে পড়ে। কোনমতে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু থেকে পায়ের পাতা অব্দি কোনরকমে ব্যায়াম করিয়ে ঐদিন পালিয়েছিল। ঘেন্না লাগে কৃষ্ণার। বুড়োগুলোর এ কী ভিমরতি! ওর পষ্ট মনে আছে বুড়ো যখন শক্ত হাতে ওর হাত চেপে ধরে লিঙ্গে ঠেসে ধরেছিল লিঙ্গটাকে বেশ খানিক শক্তই মনে হয়েছির ওর। অমা! হাত পা পড়ে যাওয়া বুড়ো ভামের ওটা দাঁড়ায় কী করে? তাহলে কি ও জায়গাটা অবশ হয়নি? হা ভগবান! কৃষ্ণা সেদিন স্বামীর বুকের কাছে শুয়ে বলে দিয়েছিল কর্তাবাবুর ঔদিনের কীর্তি। স্বামী বলেছিল–

'মুখ বুজে করে যা ক'দিন। এত টাকা একসাথে কোথায় পাবি? বুক টুক চেপে ধরেনা যেন খেয়াল রাখিস। অন্য কিছু তো আর পারবে না'।

যেন বিষয়টা ডালভাত। টাকাই সব। গরীব হওয়ার শতেক জ্বালা। শুধু গতর খাটানো নয়, গতর সামলানেরও ঝক্কি। কৃষ্ণা অবশ্য বোঝে আর সবার মতো তার স্বামীও জানে কৃষ্ণাটা একটা দারোগা। তার মেদহীন পেটা শরীরটার উপর নজর অনেকের। কিন্তু নিজেকে শোভন শাসনে রাখার কৌশল ওর জানা।

'এবার কিছু করলে ওর ভালো হাতটাও মুচড়ে দিয়ে ব্যায়ামের মুখে নুড়ো জ্বেলে চলে আসবো না? যা-ই বলো ও কাজ আমার ভালো ঠেকছে না। তোমার একটা কিছু হলেই আমি ছেড়ে দেব বলে রাখলাম'–বলে স্বামীর হাত সরিয়ে বগলের নিচে নাক ঢুকিয়ে দেয় কৃষ্ণা। এ গন্ধটা না নিলে ও ঠিক জেগে উঠতে পারে না। কৃষ্ণার স্বামী বুঝতে পেরেও নির্জীবের মতো পড়ে থাকে। কৃষ্ণা স্বামীর পিঠে খামচি দেয়, বুকের নিচে কুটুস করে কামড়ে দেয়, পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে স্বামীর পায়ের মধ্যে ঘষা দেয়। স্বামী রা করে না। কৃষ্ণা ধৈর্য হারিয়ে বলে ওঠে–

'আশি বছরের বুড়োর দাঁড়ায়, আর তোমার....'

পাশে ঘুমিয়ে থাকা ফুলকি কেঁদে উঠলে বাবা তরিৎ মেয়েকে বুকে তুলে নেয়। কৃষ্ণা ভালোই বোঝে এ যেন এক বাঁচোয়াও। সোমত্ত বউয়ের খায়েশ মেটানোর সাধ্যি আছে এসব পুঙ্গবের? সারাদিন গাধার খাটুনি খেটে এসেও শরীররটা একটু আদর-সোহাগ চায় আর ঘরে বসে থেকে কুঁড়েমির পাছায় ধূনো দিলেও মরদগুলোর কামড় ওঠে না। কৃষ্ণা স্বামীর পিঠে একটা গুতো মেরে পাশ ফিরে শুতে শুতে গজগজ করে–'ঘুম ভাঙার আর সময় পেল না বিচ্ছুটা!'

সন্ধ্যার আঁধার ঠেলে আঙিনায় পা দিয়েই কৃষ্ণা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। পাশের ঘরের বউ মায়ার কোলে ফুলকি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে। কিছু ঠাহর করার আগেই ফুলকিকে কোলে নেয়া বউটা বললো–

'আগে ডাক্তারের কাছে চল দিদি, মেয়েটা মরে যাবে তো।'

ডাক্তার ফুলকির ছিঁড়ে যাওয়া কচি চামড়া সেলাই করে দিল। দাঁতে ঠোঁট চেপে চোখ বন্ধ করে কৃষ্ণা যন্ত্রণায় চিৎকার করা মেয়েকে আঁকড়ে ধরে রাখলো। মায়া অপরাধী দুহাতে জড়িয়ে রাখলো অসহায় কৃষ্ণাকে। ডাক্তারের অসুধ নিয়ে ক্রন্দনরত মা মেয়েকে বুকে নিয়ে ঘরে ফেরারও আধঘন্টা পর ফুলকির বাবা মহেন্দ্র ফিরলো। আজই অনেকদিন পর কাজে গিয়েছিল মহেন্দ্র। ভেবেছিল একদিন পাশের ঘরের বউটার কাছে ফুলকিকে রেখে গেলে কী আর এমন হবে? বউটার মেয়ের সাথে সারাদিন খেলবে। সন্ধ্যায় কৃষ্ণা ফিরলে ফুলকিকে নিয়ে আসবে। ঐদিন কৃষ্ণাও মাইনে পাবে। আর মহেন্দ্র কাজে লেগে গেলে কৃষ্ণা আর ঐ তিনকাল বুড়োর গা-পা টিপতে যাবে না। মেয়েকে নিয়ে ঘরে থাকবে। রাঁধবে বাড়বে। ও রাতে এসে মেয়েকে নিয়ে খানিক আহ্লাদ করবে। আর কাজ ছাড়া কি পুরুষ নিজেকে পুরুষ ভাবতে পারে? বউ-এর কামাই খেয়ে বউয়ের শরীরের ওপর উঠে বাহাদুরী করতে পারে সত্যিকার পুরুষ? কৃষ্ণাটা বুঝতেই চায় না। কৃষ্ণাকে বুঝাবে কী করে–আরে বাবা, কামাইসুদ হই আগে। তখন দেখিস ঠেলা।

সেদিন সকালে কৃষ্ণা বেরিয়ে গেলে মহেন্দ্রর সাথে একই কাজ করে এমন বন্ধুলোকেরা এসে ঐদিনই কাজে লাগতে বলে। না হলে আবার একমাসের জন্য ঘরে পচতে হবে। মহেন্দ্র সুজি আর দুধের বাটিসহ ফুলকিকে পাশের ঘরের মায়ার কাছে দিয়ে বলে যায়–

'আজকের দিনটা তোমার সাগরিকার সাথে রাখ মায়া। কাল থেকে কৃষ্ণা আর কাজে যাবে না। আমি কাজ পেয়ে গেছি। আজ একটু কষ্ট করো দিদি।'

দুপুরে মায়ার পিসতুতো দাদা, যে এই প্রথম ঢাকা শহরে কাজের খোঁজে এসেছিল তার জিম্মায় মেয়েদুটোকে রেখে সমিতির টাকা জমা দিয়ে আধঘন্টার মাথায় ফিরে এসে মায়া দেখে ফুলকি মেঝের রক্তের মধ্যে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। আশেপাশের মানুষজন উঁকি ঝুঁকি দিতে শুরু করেছে। মায়ার মেয়ে সাগরিকা বসে বসে কাঁদছে। মায়া ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই দেড়-দু'বছরের সাগরিকা বলে ওঠে–মা মা, মামা না ফুলকিকে মেরেছে। আর ফুলকি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গেছে'। মায়ার বুঝতে কিছুই বাকি থাকে

না। ফুলকিকে কোলে তুলে মাথায়-মুখে জল ছিটাতেই মেয়ের সম্বিত ফেরে। ততক্ষণে বস্তির মেয়েলোকেরা সব ঘর ভেঙে ঢুকে পড়ার জোগাড়। পুরুষরা কাজ থেকে ফেরেনি অনেকেই। মায়া কিছুই বলতে পারে না। কৌতুহলী নারীদের সব জিজ্ঞাসার এক উত্তর দিচ্ছিল সাগরিকা–'মামা ফুলকিকে মেরেছে। আর ফুলকি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গেছে'।

মেয়েকে হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে এনে রাতে কৃষ্ণা আর মহেন্দ্র সিদ্ধান্ত নেয় ওই বস্তিতে মেয়েকে নিয়ে আর ওরা থাকবে না। এ নিয়ে মায়ার সাথে ঝগড়া করারও কোন যুক্তি খুঁজে পায় না। কার কাছে অভিযোগ করবে ওরা? এ কথা কি কাউকে বলার? কী চোখে দেখবে বস্তির লোকেরা ওদের? ওদের নিষ্পাপ ফুলের মতো বাচ্চাটার দিকে আঙুল তুলে কদর্য কথা বললে ওদের প্রাণে সইবে? তাদের প্রাণের মানিকধনকে নিয়ে তারা এ লোকালয় ছেড়ে দূরে, যেখানে কেউ তাদের চেনে না সেখানে চলে যাবে। মেয়েকে তারা লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবে। বড় হতে হতে শিশুবেলার সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি মেয়েরও মনে থাকবে না।

সীমান্তের কাছে এক অচেনা জনপদে গিয়ে থাকতে শুরু করলো কৃষ্ণারা। কেউ তাদের চেনে না। মহেন্দ্র কিছুদিনের মধ্যেই চোরাকারবারে বেশ দক্ষ হয়ে উঠলো। বর্ডার থেকে মহেন্দ্রের আনা ভারতীয় কাপড়ের গাট্টি থেকে ভালো ভালো ব্লাউজ পিস নিয়ে এম্ব্রোয়ডারি, চুমকি জরি বসিয়ে এলাকার নারীদের কাছে বিক্রি করে ভালো আয় করতে লাগলো কৃষ্ণা । মেয়েকে একদণ্ড চোখের আড়াল করে না কৃষ্ণা। মেয়েকে স্কুলে ঢুকিয়ে দিয়ে সামনের ছাউনিতে ব্লাউজের কাপড় নিয়ে বসে হাতের কাজ করতে থাকে। ছুটির ঘন্টা পড়লে সাত বছরের মেয়েকে যেন ছোঁ মেরে স্কুলের দরজার কাছ থেকে তুলে নিয়ে আসে কৃষ্ণা। ফুলকি ইদানিং একটু বিরক্ত হয়। মা টা যেন কী! আরও মায়েরা আছে না। তারা কি বাচ্চাদের নিয়ে ওরকম আদিখ্যেতা করে?

শারদীয়া দূর্গোৎসবের নবমীর দিন সাজিয়ে গুজিয়ে পরীর মতো মেয়েটাকে নিয়ে কৃষ্ণা আর মহেন্দ্র এসেছে মন্দিরে মায়ের পুজো দিতে। স্বামী স্ত্রী ওরা কেউ কাউকে না বললেও দু'জনেই ভগবানের কাছে মনে মনে একটাই প্রার্থনা করে 'হে ভগবান, আমাদের ফুলকির যেন কোন পাপ না হয়। কেউ যেন আমাদের ফুলকির জীবনের ওই ঘটনা জানতে না পারে। আমাদের ফুলকির যেন বড় হয়ে ভালো বিয়ে হয়। আমাদের ফুলকি যেন নিরাপদে থাকে।' মেয়েকে পাশে বসিয়ে চোখ বন্ধ করে কৃষ্ণা আর মহেন্দ্র মন্দিরের দেবীর সামনে জোড়হাতে বিড়বিড় করতে থাকে। কতক্ষণ কে জানে। চোখ খুলে চোখের জল মুছে চারিদিকে চেয়ে দেখে কোথাও তাদের ফুলকি নেই। কৃষ্ণা পাগলের মতো মন্দিরের এপার থেকে ওপারে ছুটে বেড়ায়। মহেন্দ্র মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে মন্দিরে আসা-যাওয়া মানুষদের কাছে অস্থির অসহায়ভাবে জিজ্ঞাসা করে। চোখের সামনে বারবার ভেসে ওঠে রক্তাক্ত ফুলকি, অচেতন ফুলকি। কৃষ্ণা দেবীর পায়ের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে–'ঠাকুর, আমরা পাপী। আমাদের ক্ষমা করো ঠাকুর। আমাদের ফুলকির কোন পাপ নেই ঠাকুর। ও দুধের শিশু। ও নিষ্পাপ।'

মাথার ওপর কার হাতের স্পর্শে সম্বিত ফিরে পেয়ে কৃষ্ণা চোখ মেলে দেখে মন্দিরের পুরুত ঠাকুরের কোলে ফুলকি। ফুলকির মাথায় মুকুট। গায়ে নতুন কাপড়। হাতে মিষ্টির ঠোঙা। মুখে হাসি। মহেন্দ্রও ছুটতে ছুটতে এসে থমকে দাঁড়ায়।

পুরুত ঠাকুর জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলেন–

'নিষ্পাপ বলেই তো ওরা কুমারী। কুমারীকে পুজা করা মানে পবিত্রতাকেই পুজা করা। কুমারীই হচ্ছে পবিত্রতার প্রতীক।'–বলে পুরুত ঠাকুর পেতে রাখা আসনের ওপর ফুলকিকে বসালেন। হাতে তুলে দিলেন দেবী দূর্গার নৈবেদ্য। হাতে ঘন্টি তুলে মন্ত্র পড়ার আগে কৃষ্ণা আর মহেন্দ্রের উদ্দেশ্যে বললেন–

'এ অঞ্চলে কুমারী পুজার সূচনা করলাম। এই কুমারীর বাবা-মা হিসেবে তোমরাও ভগবানের আশীর্বাদপুষ্ট হলে। এ তোমাদের ভাগ্যই বটে। কুমারীকে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করার এই মহৎ উদ্দেশ্য যেন আমাদের সকলের সফল হয়। নাও, আমার সাথে সবাই মন্ত্র উচ্চারণ করো–

'ওম্ কাত্যায়নী বিদমাহি কন্যাকুমারী ধিমাহি দূর্গা প্রচোদায়াত...

বোকা আইজেল

(কিশোর গল্প)

নাজলি হক এম এ পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে বেসরকারি সংস্থায় বেশ ভালো একটা চাকরি পেল। চুয়াডাংগা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুরে মাঝেমধ্যে টুরে যেতে হবে। সে প্রথমেই কুষ্টিয়া বাছাই করলো। তার শৈশব কেটেছে কুষ্টিয়ায়। তাদের সেই ছোটবেলার বাসা খুঁজে খুঁজে বের করলো। বাসাটার সামনে ওর বাবার অফিস ছিল। অফিসটা ভেঙে নতুন বিল্ডিং উঠেছে। পেছনে ওদের বাসাটার কংকাল দাঁড়িয়ে আছে। ওটাও ভাঙার ব্যবস্থা হচ্ছে। নাজলি একা একা বাসার মধ্যে ঘুরলো। রান্নাঘরটা যেখানে ছিল সেখানটায় বিল্ডিং বানানো মিস্ত্রিরা ইট দিয়ে অস্থায়ী ঘর তুলেছে। কিন্তু ওর সেই রান্নাবাটি খেলার কোণটা তেমনি পড়ে আছে। ছোটবেলার স্মৃতিরা সব জড় হলো। নাজলি চোখ বন্ধ করে পুরোনো সিঁড়ির ওপর গিয়ে বসলো।

সামনে বাবার অফিস। পেছনে বাসা। মা সারাক্ষণ রান্না করে। মায়ের রান্ন ঘরের চিমনি কোনদিন নাজলি ধুয়োহীন দেখেনি। তিনবোনের মধ্যে নাজলি ছোট। ওবছর স্কুলে দেবে দেবে করেও বাবা মাকে বললো–'এ বছর বাদই দাও। মেয়েটা আমার আরও কিছুদিন খেলেধূলে কাটাক। স্কুলে ভর্তি হওয়া মানেই তো শুরু হয়ে গেল সংগ্রাম। পড়াশুনা, ভালো রেজাল্ট, বৃত্তি পরীক্ষা।' কিন্তু নাজলির শখ স্কুলে গিয়ে নিজে লেখাপড়া না করে বরং পড়ানো। একবার আপুদের সাথে ওদের স্কুলে গিয়েছিল। ইংরেজি মিসকে দেখে ও একেবারে মুগ্ধ। বুকের ওপর কালো বেণি, কবজির নিচে ঝুলানো ভ্যানিটি ব্যাগ, ডান হাতে হাজিরা খাতা বুকে চেপে যখন করিডোর দিয়ে হিল খটখটিয়ে হেঁটে গেল তখন সানুপা ওকে কানে কানে বলেছিল–

'আমাদের ইংলিশ মিস। খুব ডাঁটিশ।'

তারপর থেকেই নাজলি পড়তে চায় না, পড়াতে চায়। বর্ণমালা, ধারাপাত তো ওর মুখস্ত। বোনরা স্কুলে, মা রান্নাঘরে, বাবা অফিসে নাজলি ওয়াড্রোব থেকে মায়ের শাড়ি বের করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পরে হাতে একটা খাতা ধরে ঘরের মধ্যে হাঁটে। ও হলো গিয়ে ইংলিশ মিস। পেঁচানো শাড়িতে পা চলে না। হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মা এসে দেখে পড়ে গিয়ে থুতনির নিচে কেটে রক্ত বেরুচ্ছে। তুলোয় করে ডেটল লাগিয়ে মা পেঁচানো শাড়ি খুলে আবার পরিয়ে দিলো। এবার আর হাঁটতে অসুবিধা নেই। ও হাঁটতে হাঁটতে বাবার অফিসের বারান্দায় চলে যায়। বারান্দার বেঞ্চে তের চৌদ্দ বছরের একটা ছেলে বসে আছে। লুঙ্গি পরা। ময়লা হাফ শার্ট। খালি পা। ওকে দেখে ছড়ানো দুহাত একবার কোলের ওপর রেখে আবার ছড়িয়ে দিল। দোলানো পা থামিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে

রইলো। ও যেদিকে তাকিয়ে আছে নাজলি সেদিকে গেল। ছেলেটি আবার বিপরীতে তাকালো। নাজলি জিজ্ঞাসা করলো–

'আরে তুমি কে? এই কে তুমি?'

ছেলেটি কোন কথার জবাব না দিয়ে দ্রুত উঠে গিয়ে বারান্দার নিচে দাঁড়াতেই বাবার অফিসের মধ্যে থেকে কেরামত চাচা বেরিয়ে এলো। কেরমত চাচা বাবার পিয়ন। কেরামত শাড়ি পরা নাজলিকে কোলে তুলে নিয়ে বললো–

'ছোট আম্মা, ইডা আমার ছাওয়াল। উর নাম আইজেল। বেগম সাহেবার ফাই-ফরমাশ খাটার জন্যি গিরাম তি নিয়ি আনিছি।'

কেরামত চাচা যেন কী! নাজলি এখন বুঝি ছোট যে ওকে কোলে তুলে নিতে হবে? দেখতে পায় না শাড়ি পরে ও ইংলিশ মিস হয়েছে? কেরামতের কোল থেকে জোর করে নেমে গেল নাজলি। আইজেলকে নিয়ে মার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। মা তরকারির কড়াইয়ে খুন্তির বাড়ি দিয়ে বললো–

'আগে দুটো মুখে দিয়ে নাও। পরে আমার পটলগুলো ছিলে দিও'।

মা রুটি, পায়েস আর ভাজি দিল খেতে। আইজেল যতবার রুটি ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছিল ততবার 'বিসমিল্লাহ' বলছিল। মা দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে বললো-

'খাওয়ার আগে একবার বললেই চলে'। কিন্তু নাজলি দেখলো তারপরেও সে প্রতিবারই নিঃশব্দে বলে চলেছে। শুরু হলো পটল ছিলা। একই কাণ্ড। যতবার বটিতে পটল ছিলার উদ্যোগ নিচ্ছে ততবারই 'বিসমিল্লাহ'। তারপর আযান পড়ার সাথে সাথে হঠাৎ পটল টটল রেখে অজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেল। ওর সুরা পড়ার সুর শুনে মা তো হতবাক! কী মিষ্টি কণ্ঠ আর কী সুরেলা তেলাওয়াত।

এরপর থেকে বাসায় মেহমান এলে বা ভালো ভালো রান্নার দিন মায়ের অনুরোধে কেরামত চাচা আইজেলকে নিয়ে আসতো। 'বিসমিল্লাহ' বলতে বলতে মায়ের কাজ এমনকিছু এগিয়ে দিতে পারতো না। কিন্তু ওরকম বিনয়ী আর লক্ষী ছেলেটি মায়ের সামনে থাকলে মার মন এমনিতেই ভালো হয়ে যেত। নাজলিরও ভালোই হলো। একটা ছাত্র পাওয়া গেল। নাজলি শাড়ি পরে হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে, কানে পেন্সিল গুঁজে অবসরে আইজেলের মিস হতো। ও যতো বলতো–

'বলো অ আ-হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ'

আইজেল ততো বলতো 'ওয়া রশিদির দিঘি'

নাজলি একটা বেত হাতে নিয়ে বসে মহা বিরক্ত হয়ে বলতো–

'এ কী বোকারে! হাত পাতো'।

আইজেল সাথে সাথে হাত পাততো। নাজলি আস্তে করে করে যতবার ওর হাতে বাড়ি দিত আইজেল ততবার 'বিসমিল্লাহ' বলতো।

মা আইজেলকে নতুন কাপড় কিনে দিয়েছিল। মার সাথে বাবার মাঝে মাঝে কী কারণে যেন কথা বন্ধ থাকতো। কথা বন্ধের দিনগুলো নাজলির ছিল সবচে কষ্টের। কিন্তু

আইজেল এলে আইজেলের মাধ্যমে মা বাবার কথা চলতো। তারপর কখন যেন ভাব হয়ে যেত। আইজেল আপাদের ফাই ফরমাশ খাটতো। কিন্তু কিছু কিনে আনতে বললেই উল্টোপাল্টা করতো। কাগজ কিনে আনতে বললে খাতা কিনতো আর বাদাম আনতে বললে আনতো বাতাবি লেবু। একবার মায়ের সাথে মাড় দেয়া শাড়ি টানতে গিয়ে এমন হ্যাঁচকা টান দিয়েছিল যে মায়ের প্রিয় শাড়িটা মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল। কেউই ওকে তেমন বকা দিত না কেবল নাজলি ছাড়া। অবার ঘুরে ঘুরে ও নাজলির কাছেই 'প্রথম পাঠ' নিয়ে বসতো। ভারি ইচ্ছে ছিল বাংলা পড়া শেখার। লেখাপড়া শিখে নাম সই করতে পারলেই স্যার মানে নাজলির বাবা নাকি ওকে চাকরি দেবে। নাজলি ওদের তিন বোনকে আপু বলে ডাকতে শেখাতো। কিন্তু আইজেল বলতো বড়বু, মেজবু আর নাজলিকে কুটিবু।

'এই কুটি কী, হ্যাঁ? আমি মোটা হলে আমাকে কি মুটিবু বলে ডাকতে?'

'ও আল্লা ছি! আমার বুরা কতো সোন্দর!'

ততদিনে আইজেলের মুখ ফুটেছে। আইজেল ইট দিয়ে নাজলির রান্নাবাটি খেলার ঘর বানিয়ে দিয়েছিল। কাদা মাটি দিয়ে উনুন। নাজলি ছোট হাড়ি কড়াই নিয়ে বসে খেলতো। আইজেল একটু পর পর মায়ের সবজির খোসা এনে দিয়ে বলতো–

'কুটি বু, এই নেন শাগ, আর ইডা হচ্চেগা ইলশি মাচ। বিছমিল্লাহ কয়া ত্যাল দি ভালো কইরি ভাজেন'

'বোকা! শাগ না, শাক, ইলশি না ইলিশ, আর ত্যাল কী? বলো তেল।'

'আমরা মুরুক্কু মানুষ। আমাগের উয়াই চলে'।

একবার কেরামত চাচা এসে বললো আইজেলের খুব জ্বর। সে এখন আর কদিন আসতে পারবে না। কিন্তু পোটলায় কীসব বেঁধে দিয়েছে তার কুটিবুর জন্য। নাজলি পোটলা খুলে দেখে তার রান্নাবাটি খেলার জন্য মাটির হাড়ি-কড়াই, শিমুলের বিচি, কাঁটাফলের সর্ষে আর মোটা বালু। নাজলি মনের সুখে খেলতে বসে গেল। কিন্তু ওর হুকুম শোনার জন্য আইজেল না থাকলে কি হয়?

এরই মধ্যে কবে কবে যেন নাজলির বাবার বদলীর আদেশ হয়েছে। ততদিনে আইজেল সেরে উঠে যেদিন আসলো সেদিন ওদের সব গোছগাছ শেষ। মালপত্র চলে গেছে। কেরামত চাচা মাকে আর বাবাকে সালাম করে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। মায়ের চোখে পানি। নাজলির আপুরা আগেই গাড়িতে উঠে বসে আছে। মা আইজেলকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করলো। কেরামত চাচার হাতে আইজেলের জন্য একসেট বই, নতুন জামাকাপড় আর জুতোর বাক্স তুলে দিয়ে আইজেলকে বললো–

'তুই খুব ভালোরে আইজেল। তোর জন্যে আমার খুব খারাপ লাগবে।'

আইজেল 'বিসমিল্লাহ' বলে মাকে সালাম করে সরে দাঁড়ালো। নাজলির কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু আপুদের ডাকে গাড়িতে গিয়ে বসতে হলো। গাড়ি ছেড়ে দিলে মুখ বাড়িয়ে দেখলো আইজেল তেমনিই দাঁড়িয়ে আছে। নির্বাক। ওর হাতে একটা ছোট্ট পোটলা।

চোখ মেলেই নাজলি দেখে ওর সামনে দুজন বয়স্ক দরিদ্র লোক দাঁড়িয়ে। ও লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়াতেই বয়স্কদের একজন বললো–

'আম্মা, আপনে কি শাহাবুদ্দিন স্যারের মেয়ে?'

'জ্বি চাচা। চিনলেন কী করে?'

'কেরামতের সাথ আপনাগের এই বাসাত পেরাই আইসতাম। কেরামত মারা গেল তা-ও পেরাই দশ বচ্চর হয়া গেল। ওয়ার যে ছাওয়াল আইজেল তারও তো খুব বিমার। গেরামেই থাকে।'

কেরামত চাচার জন্য নাজলির অন্তর কেঁদে উঠলো। সেই বোকা আইজেলও অসুস্থ। এক ফাঁকে একবার দেখা করে যাবে সে।

'আইজেল কী করে? ওর ছেলেমেয়ে?'

'ওডা তো সারা জীবন আল্লা আল্লা কইরেই কাটাইলো। মসজিদের মোয়াজ্জিন। মসজিদ ঝাড় দেয়, মসজিদেই ঘুমায়। বউ ছাওয়াল-মিয়াদের সাতে থাকে না। আইজকাল আর আজান দিতিও পারে না। আম্মা, একবার ওয়ারে দেখতি যাবেন নাকি? ওয়ার সারাজেবন খালি এক গল্প– আমার স্যার, আমার আম্মা আমার বু'রা'।

নাজলির চোখ ভিজে গেল। সে আইজেলের জন্য একটা ধবধবে শাদা পাঞ্জাবি, মিষ্টি, বিস্কুট আর নরম মখমলের জায়নামাজ কিনে অফিসের গাড়িতেই ওই বয়স্ক দুজনকে নিয়ে সাহেবনগর সেই মসজিদের সামনে গিয়ে নামলো। গাড়ির শব্দ শুনে আইজেল বারান্দায় বিছানো মাদুরের ওপর অনেক কষ্টে উঠে বসলো। একমুখ দাড়ি। মাথায় টুপি। গায়ে হাতায়ালা ছেঁড়া গেঞ্জি। শরীরে হাড্ডি ছাড়া আর কিছু নেই। কোটরাগত চোখ বিস্ময়ে বিমূঢ়। তার কুটিবু এসেছে।

'আইজেল দেখ বিটা, স্যারের ছোট মিয়া তোক দেখতি আইচে'।

আইজেলকে আবার বলে দিতে হবে কে এসেছে? সে তো জানে স্যার নাহয় আম্মা নাহয় তার বু'রা তাকে একদিন দেখতে আসবেই। ও তো সেই জন্যেই বেঁচে আছে। আনন্দ আর উত্তেজনায় আইজেল কাঁপছিল।

'স্যার ক্যাম্বা আছে কুটি বু?'

'তোমার স্যার দুবছর আগে মারা গেছে আইজেল ভাই'।

'কী কলেন? স্যার দুনিয়াত্ নি? আপনে কী কলেন কুটি বু?'

আইজেল হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। তার কান্না থামতেই চায় না। নাজলি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে পাঞ্জাবিটা পরতে সাহায্য করলে সে মাথা ঢুকানোর সময় বললো 'বিসমিল্লাহ'। নাজলি মিষ্টি আর বিস্কুট-এর প্যাকেট খুলে দিল। ততক্ষণে আশপাশ মানুষে ভরে গেছে। আইজেলের গল্পের মানুষরা সত্যিই এ মাটির পৃথিবীর কেউ তারা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না। আইজেলের বউ একহাত ঘোমটা টেনে নাজলির পাশে গিয়ে বসলো। নাজলি তার ঘাড়ে হাত দিয়ে কাছে টেনে নিল। বউটা কেঁদে ফেললো–

'সে তো আমাগের গিরাহ্যিই করে না কুটি বু। সে কয় যে সে স্যারের আর আম্মার ছাওয়াল। তার তিন বু'র সে একলা ভাই'।

নাজলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আরও কিছুক্ষণ ওদের মধ্যে বসে থেকে সে ব্যথাতুর হৃদয়ে অফিসের গাড়িতে গিয়ে বসে। ফেরার পথে চোখ উপচিয়ে বেরিয়ে আসা পানির ধারা সে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। কুষ্টিয়া অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারভাইজার মাসুদকে বলে এলো যেন মাঝে মধ্যে আইজেলের খোঁজ রাখে এবং তাকে জানায়।

কুষ্টিয়া থেকে ফেরার এগারদিন পর মাসুদের ফোন। সে যা বললো তা এরকম– নাজলি চলে আসার পর তিন চারদিন কেবল নাজলির দেয়া বিস্কুট আর মিষ্টি খেয়েই সে ছিল। পরে আর কিছু খেতে পারেনি। তাকে গোসল করানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছে তার বউ। সে পাঞ্জাবি খুলতে রাজি হয়নি। শুধু মৃত্যুর আগে নাজলির দেয়া জায়নামাজের ওপর তাকে শুইয়ে দিতে বলেছিল।

বৈঁচিবালিকা

আমাদের মফস্বল কলেজের বাংলা ক্লাসে ছেলেরা উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করতো। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের ডেপোগুলো। ওরা ভাবতো বাংলা সাহিত্য মানেই প্রেম। বিজ্ঞানের রসহীন খটোমটো পিরিয়ড শেষ করে ওরা টিফিনের পর বাংলা ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই ক্লাসে ঢুকে বসে থাকতো। মানবিক বিভাগের মেয়েদের সাথে খাতির জমানোর চেষ্টা করতো। আমাদের বাংলার হাসমত স্যার তখন শ্রীকান্ত শুরু করেছেন। আসলে স্যার দেখতে একদম বাংলা সিনেমার কৌতুকাভিনেতা হাসমতের মতো ছিলেন বলে কে যেন কবে ওর এ নাম দিয়েছিল। স্যারের আসল নাম আমরা অনেকেই জানতাম না। একদিন আমার বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন 'নজরুল মাজমাদার তোদের বাংলা পড়ায় না'? আমি বলেছিলাম 'না তো, হাসমত স্যার।' তো শ্রীকান্ত রাজলক্ষীর প্রেমপর্ব এলে বাংলার মুখচোরা লাজুক হাসমত স্যার দ্রুত সে অধ্যায় শেষ করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগের ভালো ছাত্র খ্যাতমার্কা সৈয়দ মুশফিক সুযোগ হারাতে রাজি নয়। বৈঁচিফলের মালা দিয়ে যে বয়সে রাজলক্ষী শ্রীকান্তকে মনে মনে বরণ করে নিয়েছিল সে বয়সটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে প্রেমে পড়ার ক্ষেত্রে কতখানি উপযোগী তা জানার জন্য সে রাজলক্ষীর প্রেম নিয়ে দড়াম করে প্রশ্ন করে বসে–

'স্যার, বায়োলজি পইড়ি আমরা জানতি পারি যে মেয়িমানষির এগারো বারো বছরের একোলে ফার্টিলাইজেশন হয় না। তাহলি কী কইরি নয় বচ্ছর বয়সে রাজলক্ষীর মনে প্রেমভাব জাগ্রত হইলু?'

মুচকি হেসে স্যার বললেন–

'প্রেমের ক্ষেত্রে তোর বায়োলজি খাটে না রে আহাম্মক'।

তো এই স্মৃতির অবতারণার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আমার নিজের প্রেমের গল্প বলা। আমার বয়স তখন আট। রাজলক্ষীর হৃদয়দানের বয়সের চেয়েও একবছরের ছোট। আমার বড় আপা তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। লেখাপড়া ছাড়াও যে সমাজ সংসারে কতদিন কতকিছু ঘটে যায় তার কোন খোঁজখবর রাখতো না সে। মা আমাকে দিয়ে ওর পড়ার টেবিলে চা নাশতা পাঠাতো। আমি এদিক ওদিক নাচানাচি করে একঘন্টা পরে গিয়ে দেখতাম টেবিলে চায়ের ওপর ঠাণ্ডা আস্তরণ ফ্যানের বাতাসে ঝিরঝির করে কাঁপছে। দাঁড়াতেই–

'যা তো মাকে বল আর এক কাপ চা দিতে'।

আমি মনে মনে বলতাম 'বইয়ে গেছে'। কিন্তু ভালো ছাত্রীর হুকুম না শুনলে কি আর রক্ষে আছে? আমারও তো সামনে ক্লাস থ্রির হাফইয়ারলি। কই মাতো কাউকে দিয়ে আমার জন্য চৌদ্দবার চা পাঠায় না? আপাকে নিয়ে বাবারও ভারি বাড়াবাড়ি! একটু সর্দি

লাগলো তো ডাকো ডাক্তারকাকুকে। আজ গা গরম গরম লাগছে তো গোসল করে কাজ নেই। চোখ লাল কেন? নির্ঘাৎ জ্বর। মাথার কাছে জানালা খোলা? বাপরে ঠাণ্ডা বাতাসে গলা ব্যথা হবে না? আমার নাহয় রোগ বালাই কমই হয় তাবলে আমার কপালে হাত দিয়ে দেখতে হবে না? ও, তাহলে ওর গায়ের রঙ চাঁপাফুলের মতো আর আমার রঙ চাপা বলে? কিন্তু ও তো আসলে বোকা। ও কেবল বইয়ে ডুবে থাকে। আমি বলি–

'আপা, দেখবি চল দোপাটির পাখা খুলতে শুরু করেছে। এক্ষুণি গেলে পাখা মেলা দেখতে পাবি'

'ম্যালা বকিসনে। ওটা ছিঁড়ে এনে এখানে রাখ'

'ই! ওটায় কেউ হাত দিলে আমি তার ইয়ে ছিঁড়ে দেব না!'

'তাহলে ভাগ'।

আপাকে পরীক্ষার পড়া দেখানোর জন্য বাবা বিশুদাকে ডেকে এনেছে। বিশুদা হলো গিয়ে আমাদের পাশের বাড়ির ডাক্তারকাকুর ছেলে। ইন্টারমিডিয়েটে কলেজে ভর্তি হয়েছে। সবসময় সাদা হাফ শার্ট আর পাজামা পরে নীল রঙের একটা সাইকেলে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চক্কর দেয়। কেন চক্কর দেয় সেটা হাঁদারাম আপাটা না বুঝলেও আমি ঠিক বুঝতে পারি। আমি বারান্দার লোহার বেঞ্চে বসে পা দোলাই আর বিশুদা সাইকেল থেকে ঝট করে পা নামিয়ে একবার বেল বাজিয়ে বেশ জোরেই বলে–'ঝুনু ডাকছে তোমাকে'। ভেতরে আপার কানে বিশুদার কণ্ঠস্বর পৌঁছালে আপার পড়ায় বিন্দুমাত্র বিঘ্ন ঘটে না জানি কিন্তু বিশুদাকে দেখলেই আমি লজ্জায় আধামরো। আমার এতো লজ্জা লাগে যে আমি দৌড়ে গিয়ে আলমারির আড়ালে দাঁড়াই। ডাক্তারকাকুর ছোটমেয়ে ঝুনু আমার বন্ধু। আমি ঝুনুর সাথে ওদের বাড়ির ঠাকুরঘরের পেছনে রান্নাবাটি খেলি। একদিন বিশুদা এসে–

'কী রাধছো গো তোমরা? আমায় একটু খেতে দেবে?'–বলে পাত পেড়ে বসে গেল।

'দাদা! যাও আগে চান করে এসো। এখোনো শুক্তোটা বাকি'–ঝুনু দাদাকে ঠেলে ওঠাতে চায়। আর আমি সংকোচে মরে যেতে যেতে বিশুদার সামনে খেলনা গ্লাসে পানি আর থালা ধুয়ে রাখতে গিয়ে নিজেকে মনে হতে লাগলো আমি যেন ওর বউ, ও আমার বর। সেই আট বছর বয়েসে। রাজলক্ষীর হৃদয়দানের বয়সের চেয়েও একবছরের ছোট। আমি মরি প্রেমে আর ও কিনা জিজ্ঞাসা করে 'তোমার দিদি খুব পড়ছে না? ফার্স্ট ডিভিশন পেতে হবে কিন্তু। বলো বিশুদা বলেছে।'

মনে মনে বললাম 'আমার বইয়ে গেছে'।

বিশুদা আপাকে পড়া বোঝাতে আসে। মা চা সিঙ্গাড়া বানিয়ে দেয়। আমি চা দিতে গিয়ে বিশুদার টেবিলে রাখা হাতের নিচ দিয়ে মাথা নামিয়ে ফিরে আসি। আসলে তো আমি বিশুদার গন্ধ নিই। বিশুদার গায়ে কেমন ধূপ আর সিগারেটের গন্ধের মিশেল। আমি আবার আলমারির পেছনে গিয়ে চোখ বন্ধ করে মনে মনে বিশুদার শার্টে নাক ঘষি। বিশুদা আপার টেবিল থেকে না ওঠা পর্যন্ত আমি একবার চায়ের খালি কাপ তুলে নিয়ে

আসি, একবার গিয়ে সিঙ্গাড়ার তসতরি, একবার না চাইতেও পানির গ্লাস হাতে দাঁড়াই। আস্ত গবেট আপাটা কেবল অংক কষে। একবার লুকিয়ে দেখি হাত থেকে কলম পড়ে গেলে আপা আর বিশুদা দুজনেই তুলতে গিয়ে মাথায় ঠোকাঠুকি। আরও একবার বিশুদা ইচ্ছে করেই কি জানি না কলম ফেলে দিয়ে ঠোকাঠুকির অপেক্ষার আগেই আমি দৌড়ে গিয়ে কলম তুলে দিয়ে আসি।

আমার কড়া নজরদারির মধ্যে আপার ম্যাট্রিক পরীক্ষার পড়া তৈরী হলো। আমার নজরদারি কেবল আমিই জানতাম। মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত, বাবা অফিসে। তখন যুদ্ধ আর স্বাধীনতা বড়দের মধ্যে একমাত্র আলোচ্য ছিল। স্কুল কলেজ বন্ধ। চারিদিকে যুদ্ধের দামামা। আমি বারান্দার দড়িতে রঙিন কাগজ কেটে কেটে টাঙিয়ে দিতাম। বুঝে না বুঝে স্বাধীনতার আগাম প্রস্তুতি। ওখান থেকে আপা আর বিশুদার লেখাপড়ার বাইরের কোন ভঙ্গিই আমার নজর এড়াতো না। কিন্তু আপার চোখে-মুখে কোন দুস্পাঠ্য বিষয় আমাকে উতলা করেনি। তবে মুখের রঙ বদল হতে দেখেছি বিশুদার। আপার মুখ নিচু করা মনোযোগী চোখ, বাঁকা ঠোঁট, কোকড়া চুল, অর্ধচন্দ্র কপাল, মসৃণ চিবুক, লতানো হাত, নিস্পাপ চাউনি, ফ্যানের বাতাসে ওড়া অস্থির ওড়নার স্থানবদল বিশুদাকে বিচলিত করলেও আপার কোন ভাবান্তর ছিল না। বিশুদা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি এমনকি আমার পেশাব-পায়খানার বেগও সামলে রাখতাম। ঝুনু যেদিন আমার সাথে খেলতো সেদিন ও দুপুরে খেয়ে আমার পাশেই ঘুমাতো। একদিন ওদের বাড়ি একদিন আমাদের বাড়িতে আমাদের খেলার আসর বসতো। বিশুদাও একদিন পরপর আসতো। আমি বিশুদার পড়ানোর শিডিউল মাথায় রেখে ওদের বাড়িতে খেলতে যেতাম।

এরই মধ্যে যুদ্ধের ভয়াবহতা বড় বড় শহরগুলোকে গ্রাস করতে লাগলো। আমাদের মফস্বল শহরেও মুক্তি সন্দেহে যুবক ছেলেদের ধরপাকড় শুরু হলো। ডাক্তারকাকুর বৈঠকখানায় রোজ রাতের তাসের আড্ডা থেকে বাবার আঁধারের নিস্তব্ধতা ভেদকরা 'ডাবল' ধ্বনি ভেসে আসা ক্রমেই বন্ধ হলো। সপ্তাহান্তে রাতে মা যেত কাকীমার সাথে আড্ডা দিতে। কাকীমা পানের বাটা নিয়ে বসতো। রেকাবিতে নাড়ু। আমি সাথে গিয়ে ঝুনুর ছড়ার বই দেখতাম। ওগুলো ইন্ডিয়া থেকে আনা। 'আলতা বাদুড় চালতা বাদুড় কলা বাদুড়ের বে, টোপর মাথায় দে'–এসব আমাদের ছড়ার বইতে ছিল না। আমার খুব ইচ্ছে হতো একবার বিশুদার ঘরে ঢুকে বিশুদার বিছানার ওপর পা ঝুলিয়ে বসতে। বিশুদার অগোছালো বিছানা গুছিয়ে দিতে। কিন্তু গেলেই সেই তো– 'তোমার দিদি এলো না? খুব পড়ছে, না?' এসব বিরক্তিকর প্রশ্নের সম্মুখিন হওয়া। বসে বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে মা-কাকীমার এতো এতো গল্প তবুও দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেও গল্প শেষ হতো না। আরে বাবা এ গল্পটুকু বসেই বসেই সেরে নিতে পারতিস। আমাদের বাগানে দাঁড়িয়ে মা কাকীমার সন্ধ্যাবধি গল্পও আর তেমন ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারলো না। ওদের বাড়ির বারো মাসের তেরো পার্বনের পুজোয় 'ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং' ঢাকের বাড়ি এতো মৃদুস্বরে হতে লাগলো যে আমি গিয়ে পুজোর প্রসাদও জোগাড় করতে পারতাম না। ঝুনু আর আগের মতো আমাদের বাড়িতে যখন তখন চলে এসে বলতো না–

'তুই একটু খেয়ে আমাকে সেই গ্লাসেই জল দে। এক গাসের জল না খেলে বন্ধু হওয়া যায় না। দেখিস কাউকে বলিস না'। একবার ঝুনু ওর মায়ের সেলাই মেশিনের বাক্স থেকে চুরি করে সূঁচে সুতো পরানোর ছোট্ট একটা যন্ত্র দিয়েছিল আমাকে। আমি বাগান পেরিয়ে বাড়ি আসতেই ওটা হাত থেকে পড়ে কোথায় যে হারালো আর খুঁজে পেলাম না। পরদিন অনেক সংকোচে অনেক দুঃখে ঝুনুকে বলতেই ও বললো–

'শোন, রাতে ঘুমোবার আগে তোর বালিশে আঙুল দিয়ে তিনবার রাম রাম রাম লিখে তারপর ঘুমোবি। পরদিন সকালে উঠে দেখবি তোর বালিশের নিচে সেই হারানো জিনিসটা'।

আমি মাকে লুকিয়ে নির্ধিদ্বায় বালিশে তিনবার রাম নাম লিখে ঘুমোলাম। উত্তেজনায় ঘুমই আসতে চায় না। সকাল হতেই জানালায় ঝুনু। খুব নিচুস্বরে জিজ্ঞাসা–

'কিরে লিখেছিলি?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বালিশ উল্টিয়ে দেখি কিছুই নেই। বললাম–

'হ্যাঁ, লিখেছিলাম তো'।

'সত্যি, বিদ্যা'?

'বিদ্যা'।

ঝুনু কেমন অবিশ্বাস নিয়ে ফিরে গেল। ও হয়তো ভেবেছিল আমি মুসলমান হয়ে কখনই রাম নাম লিখতে পারবো না।

যেদিন আপার পরীক্ষা শেষ হলো সেদিন বিশুদা এসেছিল দুপুরে। যুদ্ধের বছরে পরীক্ষা দেয়া না দেয়া নিয়ে দোলাচলতা, অস্থিরতা, অচলাবস্থা, এতসবকিছুর পরেও পরীক্ষার টানা ব্যস্ততা শেষে একধরনের স্বস্তিতে খেয়ে দেয়ে মা বাবা দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমি যথারীতি সচকিত। দেখলাম প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে কোন প্রশ্ন ছাড়াই বিশুদা আপার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হাতে ধরা প্রশ্নপত্র থিরথির করে কাঁপছে। এই প্রথম আমি আপার গালে গোলাপ ফুটতে দেখলাম। এই প্রথম দেখলাম আপা বারবার কপালের ওপর থেকে চুল সরাচ্ছে, ওড়না ঠিকঠাক আছে তবুও টেনে টেনে আরও ঠিক করার চেষ্টা করছে। এই প্রথম বিশুদার সামনে থেকে আপা দৌড়ে পালিয়ে যেতে গিয়ে চৌকাঠে পা বেধে পড়তে পড়তে সামলে নিল। বিশুদা পেছন থেকে অস্ফুটে 'আহ্' করে উঠলো। আহারে! যেন নিজের পায়েই ব্যথা পেয়েছে। আমি দিব্যি দাঁড়িয়ে দেখলাম সব। আমাকে ওরা গ্রাহ্যই করলো না।

কয়েক মাসের পড়াশুনার চাপ চলে যাওয়াতে দেখলাম আপা ঘুমাচ্ছে। ঘুমাচ্ছিল না মুখে বালিশ চাপা দিয়ে বিশুদার কথা ভাবছিল কে জানে? সন্ধ্যাবেলার একটু আগে বাইরের বারান্দায় বসে তেঁতুলমাখা খাচ্ছিলাম আর সাথে বিশুদার ঘটনাটা মাকে কীভাবে বলে দেয়া যায় তার পরিকল্পনা করছিলাম। হঠাৎ আকাশটায় মুহূর্তে ডালিম ফুলের রঙ ছড়ালো। গোধূলির রঙ সেদিনের দুপুরের আপার মুখের রঙের সাথে কেমন মিলে যাচ্ছিল। বারে, আপার রঙ চাঁপাফুলের মতো আর আমার রঙ নাহয় একটু চাপা তাবলে আমি কি দেখতে খারাপ? বরং সবাই বলে আমার চোখদু'টো নাকি আপার চেয়েও সুন্দর। বিশুদা কখনও কেন আমার চোখের দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকে না?

আরে! সাইকেল থামিয়ে বিশুদা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। হাতে সাদা গন্ধরাজের গোছা। বিশুদাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। হাতের তেঁতুল ফেলে দিয়ে চেটে আঙুল পরিস্কার করে উঠে দাঁড়াতেই বিশুদা আমার দিকে এগিয়ে দিল সুতো দিয়ে গোড়াবাঁধা সদ্যফোটা ফুলের গোছা। বিশুদাদের বাগানের ফুল। ফুলের মধ্যে কাগজে ইংরেজিতে কী যেন লেখা।

'দিদিকে দিও'–বলে সাইকেল ঘুরিয়ে প্যাডেল দিতেই কাছে পিঠে কোথাও বোমার আওয়াজ শোনা গেল। তারপর পরপর দুটো গুলির শব্দ। মা আর আপা হা হা করে ছুটে এসে আমাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। তখন চারিদিকে নিস্তব্ধতার আলোছায়া। আমি মায়ের কোল থেকেই বাগানের বেড়ার ওপারে ফুলের গোছা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। ঝোপের মধ্যে কোথায় গিয়ে ওটা জায়গা আলো করে বসে রইলো আমরা কেউ জানতে পারলাম না।

পরদিন সকাল। অন্যদিনের মতো নয় যেন। কেমন স্তব্ধতার মোড়কে চারিদিক শুনশান। একদিন সকালে ঝুনু এসে আমাদের জানালায় দাঁড়ায়, একদিন আমি। আজ ঝুনুর পালা ছিল। ওর অপেক্ষায় থেকে স্যান্ডেলে পা গলিয়ে ওদের বাগান পার হলাম। ওদের গহর গোয়ালা নিত্যদিনের মতো গরুর গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। তবে ধারে কাছে ওদের কুকুর লালু নেই। রোজ সকালে লালু অকারণে বাগানের এ মাথা থেকে ও মাথা দৌড়ে এসে গহরের গা ঘেষে জিব বের করে হাঁপায়। দেখলাম ওদের লাল দালানের উঁচু জানালা বন্ধ। গহরকে জিজ্ঞাসা করলাম–

'গহর ভাই ঝুনু ওঠেনি?'

গহরের হাত গরুর গলায় আরও দ্রুত ঘুরছিল। অস্থিরতা। হাতের পোঁছায় চোখ মুছে ইশারায় বাড়ির মধ্যে যেতে বললো। খিড়কি দরজা পেরিয়ে ঠাকুর ঘর। লাল শানের তেলতেলে মেঝের ওপর তিনটে শুকনো কাঁঠাল পাতা। রোজকার মতো মেজে রাখা ঝকঝকে কাঁসার বাসনগুলো নেই। ভেতরে গনেশ ঠাকুরের বেদীমূলে ফুলের ক'টা মরা পাপড়ি। দু'টো নেতিয়ে পড়া গন্ধরাজ। বুকটা ধক করে উঠলো। দরদালানের সবক'টা দরজা বন্ধ। বারান্দায় তারে কাকীমার সরুপেড়ে শাদা শাড়ি বাতাসে উড়ে একখানে জড়ো হয়ে আছে। ঝুনুর পুরোনো ঘটিহাতা জলছাপ জামাটা চৌকির পায়ার কাছে পড়ে আছে। কাশীর পেয়ারা গাছের নিচে অনেক ঝরা মুকুল। লালু সিঁড়ির ওপর বিছানো দু'পায়ে মুখ রেখে একবার লেজ নাড়লো। রান্নাঘরের সামনে খোলা উনুনের মুখে পানি দিয়ে নিভানো কাঠ কয়লা। টিউওয়েলের নিচে কলস বসাতে বসাতে অনেকদিনে সৃষ্টি ছোট্ট মসৃণ গর্তটা শুকনো খটখটে। গহরের পেছনে পেছনে বিস্মিত চোখ নিয়ে আপা এসে ঢুকলো।

'কয়েকদিন থেকেই গোছগাছ চলছিল। গতকাল মাঝরাতে বাবুরা সবাই ইন্ডিয়া চলে গেছেন'। গহর ঠাকুরঘরের বারান্দা থেকে শুকনো পাতা হাতে নিয়ে মচমচ করে ভাঙতে ভাঙতে বললো। ওরকম পাতা ভাঙার শব্দ ঝুনুর জন্য আমার বুকের মধ্যেও শুনতে পেলাম। আমার কম কথাবলা ভালো ছাত্রী আপা চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠলো। ওর কান্না দেখে এতক্ষণ পর এই প্রথম বিশুদার চলে যাওয়াতে আমার গুমোট ভেতরটা ফুরফুরে হয়ে উঠলো। আমার বয়স তখন আট। রাজলক্ষীর হৃদয়দানের বয়সের চেয়েও একবছরের ছোট।

তখন ফেব্রুয়ারিতেও জমাট শীত। গ্রামগঞ্জ বলে কথা। রাত নটার পরপরই গভীর রাত। সদ্য স্বাধীন দেশ। কিন্তু একটু অবস্থাপন্নরা হুঁশিয়ার। যুদ্ধজয়ী ছেলেরা অনেকেই অস্ত্র জমা দেয়নি। যারা সত্যিকারের জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিল তারা বাদে যারা কেবল নামেই 'মুক্তি' ছিল তারাই হয়ে উঠলো আসল নায়ক। ব্যক্তিগত আক্রোশে নির্বিরোধ মানুষগুলোকে হেনস্তা করা শুরু করলো। যোগ্যতাহীন হয়েও যে বাড়ির কেউ যুদ্ধে যায়নি সে বাড়ির সুযোগ্যা সুন্দরী মেয়েটিকে রাজাকারের মেয়ে আখ্যা দিয়ে দাপটের সাথে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে লাগলো।

এসব নায়কদের অনেকেই ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নেয়নি। দুর্গম গ্রামাঞ্চলে যেখানে পাকবাহিনী নদী-কাদা পেরিয়ে অপারেশনে যেতে উৎসাহ পেত না সেখানে গিয়ে দশ বারো দিন করে থেকে রাত-বিরেতে নিজের গ্রামে ফিরতো। সেসব অচেনা গ্রামে গিয়ে বলতো ওরা মুক্তিসেনা। যুদ্ধের শোনা গল্প নিজেদের বলে চালিয়ে দিত। মায়েরা করুণ মমতায় কষ্ট করে জোগাড় করে রাখা ঘরের দুধটা ডিমটা পরিবারের কাউকে না দিয়ে লুকিয়ে রান্না ঘরের ঝাঁপ ফেলে দিয়ে ওদের সামনে বসে খাওয়াতো আর জিজ্ঞাসা করতো–

'হ্যাঁদে বাপ, যুয্‌যু থামলি পরে আমাগের আর কুনু কষ্ট থাকপে না? আমরা সগলিই বড়নোক হয়্যি যাবো?'

ওরা সব চেটেপুটে খেয়ে ডিমের কুসুমটা সবার শেষে মুখে পুরে বলতো–

'চাচীগো, দ্যাশ স্বাদীন করার জন্যিই তো যুদ্ধ করচি। স্বাদীনতা ছাড়া কুনু দ্যাশের উন্নতি হতি পারে?'

'স্বাদীন মানে কীরে বাপ?'

'স্বাদীন মানে এই ধরো যে আমাগের কেউ শোষণ করতি পারবে না। আমাগের তা আমরা খাবো'।

'শুষুন মানে? আমাগের উরা শুইষি খাচ্চে'?

'হয় চাচী'।

আবার নিজের গ্রামে ফিরে গিয়ে সন্ধ্যা ঘন হয়ে এলে যেসব বাড়িতে উঠতি সুন্দরী মেয়ে ছিল তাদের বাড়িতে গিয়ে উনুনের ধারে বসে মেয়ের মা-চাচীদের সাথে নিজের বীরত্বগাঁথা ফলাও করে জাহির করতো আর মাটির তাওয়া থেকে ভাঁপওঠা চিতই তুলে দুভাগ করে ফুঁ দিয়ে পরমানন্দে খেতে খেতে বলতো–

'বুইজলেন চাচী, আইজ বিরিজের ফোকটে লুকি দেখি কি এক শালার পাঞ্জাবি। বিড়ি ফোঁকচে, আর উপরপান মনের সুকি ধুমু ছাড়ছে। পচ্চিম দিকির যে কুনায় জঙ্গলে

এক্কের অন্দকার ভুরকুইস্টু সেইখেন তি মারলাম ছর্‌রা। সুমুন্দি পুঙ্গা উল্টি দিড়িম দি পইড়লো। তার বিড়ি উইড়ি আমার মাতায়। ভাবলাম এক টান দেবো। মনে হইলু শালা পাঞ্জাবির আঁইটু মুকি দিলি আমি কিসির বাঙালি?'

কখনও কোন লাজুক পঞ্চদশী মা-চাচীর তির্যক দৃষ্টি উপেক্ষা করেও যখন মুক্তিযোদ্ধাদের এরকম গল্পে কান খাড়া করতো তখন তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে নায়কেরা আরও মুখর হতো। নিজেকে বীরোত্তম প্রতিপন্ন করতে বলে ওঠতো–

'কাইল সন্দ্যির সুমায় যে দুইটু বুমার আওয়াজ পালেন না চাচী, ছিরামপুরির বিরিজ উড়ি দিইছি তো। কারুক বোলবেন না, এক হপ্তার মদ্যি আমাগের গিরামেরডাও গুইড়ু কইরবো। আগে স্বাদীন দ্যাশ, তারপরে লেকাপড়া। আমরা কষ্ট করি আর ভালো মানষির ছেইলিগের খালি লেকাপড়া। স্বাদীন হোক না, কোন বাপে ওগের বাচায় তাই দেইকি নোবো।'

এই ভালো মানুষের ছেলে আর কেউ না, সবুজ। এসব নায়কেরা সবাই জানে গ্রামের উঠতি সুন্দরীরা সবুজের প্রেমে পাগল। সবুজ সুদর্শন। শহরের কলেজে পড়ে। ভালো ছাত্র, ব্যক্তিত্বময়, রোগা। বিধবা মায়ের অন্ধের যষ্ঠি। আট বছরের একমাত্র ছোটবোনের সকল মমতার উৎস। গ্রামের ছেলেমেয়েদের সে স্বেচ্ছায় পড়ায়। যৎসামান্য পৈতৃক জমির দেখাশুনা করে। নিজের বাড়িতে অনেক পরিশ্রমে তৈরী লাইব্রেরিতে বসে পুরু লেন্সের চশমা পরে হারিকেনের আলোয় রাত জেগে পড়াশুনা করে। প্রায়ই অসুখে ভোগে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বিধবা মা, অসুখের শরীর আর ছোট বোনটার জন্য তার যুদ্ধে যাওয়া হয়ে ওঠে না। কিন্তু তার নিজের একটা সান্ত্বনা আছে যে সে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর সময় বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাসটা বুঝিয়ে বলতে পারে। ইতিহাস পৌরনীতিতে যে পাকিস্তানের বর্ণনা আছে তার কতটুকু সত্যি আর কতখানি আরোপিত তা সহজভাবে তাদের মগজে ঢুকিয়ে দেয়ার চমৎকার উপস্থাপনায় সে পটু। সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ না করলেও মুক্তবুদ্ধির বীজ যে সে বপন করার চেষ্টা করছে–তা কি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সামান্যতম অবদান নয়? আর নিজের আদরের ছোট বোন স্বপ্নাকে নিয়ে তার স্বপ্নের শেষ নেই। ঐ বয়েসেই সে তাকে বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' পড়ে শোনায়। নারী শিক্ষিত-স্বনির্ভর না হলে কেন দেশের সার্বিক উন্নয়ন পিছিয়ে যাবে, কোন কোন ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান তাদের শোষণ করছে, তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি কী, কীভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে–সব। বলতো–

'বাবু, এখন থেকেই পড়বি। যা পাবি তা-ই। পড়ার কোন বিকল্প নেই। না পড়লে কূপমণ্ডুক হয়ে থাকবি। পড়তে পড়তে একদিন বুঝবি মেয়েরা কেন পিছিয়ে আছে। আমার বাবু যেন পিছিয়ে পড়ার দলে না ভেড়ে'।

ম্যাট্রিকে ভালো রেজাল্ট করে মেধাবৃত্তি পেয়ে সবুজ মায়ের জন্য একটা রঙিন শাড়ি কিনেছিল আর বোনের জন্য সরু সোনার চেইন। ছোট্ট লকেটে লেখা 'বাবু'। বোনকে কেবল ও-ই বাবু বলে ডাকতো। আর কেউ না। সাত বছর ধরে শাদা শাড়িপরা মা যদিও ছেলের দেয়া রঙিন শাড়ি পরেনি কিন্তু দেশ যেদিন স্বাধীন হলো সেদিন গোসল করে

একবার ছেলে মেয়ের সামনে মিনিট দশেকের জন্য পরেছিল। সবুজের চোখ নতুন দেশ আর মাকে যেন কেমন গুলিয়ে ফেলছিল। মায়ের কোলে মাথা রেখে বলেছিল–

'মা, আমার কী যে ভালো লাগছে!'

মা বোঝেনি ছেলে মাকে দেখে বলছে না কি স্বাধীনতার আনন্দে উদ্বেলিত।

সত্যিকারের যোদ্ধারা ফিরে এসে সবুজকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। তারা জানতো এই রোগা-পটকা নিষ্পাপ ছেলেটির গোপন ব্যথা। গ্রামের কাছেই রেলওয়ে ব্রিজের ওপর পাকিস্তানি মিলিটারি আর তাদের দোসরদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ছেলেটিকে কীভাবে লুকিয়ে-চুরিয়ে থাকতে হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামে অনাত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে। দেশে থাকলেও এসব যুবক ছেলেরা কেউই শান্তিতে ছিল না। আর সবুজতো দেশের ভবিষ্যতের জন্যই কাজ করেছিল। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া কি মুক্তিযুদ্ধের অংশ নয়? কিন্তু সেই ফেব্রুয়ারির মধ্যরাতে যখন জ্যোৎস্না স্থির ছিল সবুজদের দোচালা টিনের চালে তখন ওদের ঘরের মধ্যে দুটো গুলির আওয়াজ হয়েছিল। অনেকে ভেবেছিল গ্রামের লাবণ্যময়ী মেয়েটির সাথে দুদিন বাদে সবুজের বিয়ে উপলক্ষে পটকা-টটকার আওয়াজ। ভোরে রক্তে ভেসে যাওয়া মেঝের ওপর ছেলের লাশ বুকে নিয়ে নির্বাক বসে ছিল সবুজের মা। বোন স্বপ্নার গগনবিদারী কান্নায় উপস্থিত কেউ নিজেকে সামলাতে পারেনি। বাগদত্তা লাবণ্যময়ী মেহেদি রাঙানো হাত দিয়ে সবুজের শরীর ছুঁতেই সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেল। কঁচি-কাঁচা কিশোর-কিশোরীরা যাদের কাছে সবুজ ছিল দেবতা তারা পাগলের মতো কাঁদতে লাগলো। মানুষের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছিল ছোট্ট স্বপ্নাকে। সে কাউকে চিনতে পারেনি। চারজন অস্ত্রধারী কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে প্রথমে খোলা জানালা দিয়ে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে তাদের জিম্মি করে দরজা খুলিয়েছিল। ওরা সময় নেয়নি। ঢুকেই সবুজের বুকের সামনে দু'হাত মেলে দাঁড়ানো মাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পরপর দুটো গুলি করে স্বপ্নার গলার চেইনটা হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে ওরা চলে গিয়েছিল। কেন কী কারণে সবুজকে ওরা মেরে ফেললো তা মা বা স্বপ্না বুঝে উঠতে না পারলেও মানুষজনের গুঞ্জন থেমে থাকেনি। গ্রামের সবচেয়ে রূপবতী মেয়েটিকে পাবার অধিকার যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে তাদের। আর যে সব যুবক মুক্তিযুদ্ধে যায়নি তারা সবাই রাজাকার। একটা রাজাকারেরও মুক্ত দেশে থাকার অধিকার নেই। সবুজের মৃত্যু এমন কিছু অন্যায় নয়।

কিন্তু সবুজদের গ্রামে আরও অনেক যুবক যারা যুদ্ধে যেতে পারেনি সবুজ হত্যার পর তাদের বাড়ি থেকে আর কোন গুলির আওয়াজ ওঠেনি। তবে পঁচাত্তর সালের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত নায়কদের অনেকেই যারা রাজাকারমুক্ত দেশগড়ার অঙ্গীকার করেছিল তারা একে অন্যের গুলিতে মারা গেল। ছেলেহারানো পাগলপ্রায় মায়ের একমাত্র অবলম্বন স্বপ্না ভাইয়ের আদর্শ বুকে বেঁধে মায়ের আগ্রহে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে লাগলো। সবুজের আদর্শে গড়া ক্ষুদে বাহিনী ততদিনে যৌবনে টগবগে। ওরা অনেকেই ভালো রেজাল্ট করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো। স্বপ্না আর ওর ছোটবেলার ক্লাসমেট ফাহিম আগ্রহী দেশপ্রেমী সজ্জনদের সহযোগিতায় সবুজের জমানো বই দিয়ে

গ্রামে একটা পাঠাগার গড়ে তুললো। নাম দিল 'সবুজের স্বপ্ন'। আরো অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য স্বপ্না আর ফাহিম একসাথে পথচলার সিদ্ধান্ত নিল। ফাহিমের মতো ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে হওয়া নিয়ে স্বপ্নার মায়ের কোন দ্বিমত ছিল না। মেয়ের বিবেচনাবোধকে ওর মা সম্মান জানালো। ফাহিম যেন হারিয়ে যাওয়া তার সেই ঋজু, বইপাগল, দেশপ্রেমী, রোগা আর মা-অন্তপ্রাণ সবুজ। সবুজের আদর্শ লালন করেই তো ওদের বেড়ে ওঠা। ওরা সবাই এক একজন সবুজ। বেঁচে থাকার নতুন প্রেরণা।

গ্রামের অপরপ্রান্তে তুলনামূলক সচ্ছল ফাহিমের বাড়িতে আগেও গেছে স্বপ্না। ফাহিমও এখন তার বিধবা মায়ের সবেধন নীলমণি। যুদ্ধের পরের বছর ওর বড় ভাইকে কে বা কারা ওদেরই বাড়ির বাইরের বাগানে গুলি করে হত্যা করে। ফাহিমের কচি প্রাণে ধারণ করা মুক্তিযোদ্ধা বড়ভাইয়ের জন্য যে জায়গা প্রতিনিয়ত আলোকিত হয়ে উঠতো স্বপ্নাও সে আলোয় অহংকারের বীজ বুনে যেত। স্বজন হারানো বেদনা আর মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসুরী হওয়ার গর্ব স্বপ্না ফাহিম দুজনকেই একই মোহনায় টেনে নিয়ে যেত। এবার সেবাড়ির বউ হয়ে প্রবেশ করলো। নতুন সম্পর্ক, নতুন অনুভব। এতদিন যে বন্ধুর হাতের ছোঁয়া তার ত্বক অতিক্রম করে মর্মে পৌঁছতে পারেনি সেদিন পাশে তার উপস্থিতিতেই আমূল আন্দোলিত হতে থাকলো স্বপ্না। আত্মীয়স্বজনের বউ দেখার উৎসব শেষ হলে গ্রামের রাত মধ্যযামে না পৌছাতেই চারিদিকে ঝুম নিরবতা নেমে এলো। প্রণয়ীকে একান্তে পাবার অস্থিরতায় স্বপ্নার আর কোন আনুষ্ঠানিকতা ভালো লাগছিল না। ও শুনেছে সবচে ছোট রাত নাকি বাসর রাত। সেই ছোটরও অর্ধেক শেষ হয়ে গেল। ফুলের ঝালর সরিয়ে নিজের ঘরের খাটে ক্লান্তির পা ছড়িয়ে বসতেই বৃদ্ধা শাশুড়ি ছেলের হাত ধরে ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন। ছেলেকে স্বপ্নার পাশে বসিয়ে স্বপ্নার ঢলঢল মুখখানা দুই তালুতে পরম মমতায় ধরে চুমু খেলেন। হাতের মুঠোর মধ্যে রাখা ছোট্ট বটুয়া থেকে একটা হার বের করে বউমার গলায় পরিয়ে দিলেন। স্বপ্না নেমে দাঁড়িয়ে শাশুড়িকে সালাম করলে শাশুড়ি গভীরভাবে বউমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করে বেরিয়ে গেলেন। ফাহিম শব্দহীন দরজার হুড়কো লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্বপ্না শাশুড়ির দেয়া সোনার চেইনটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে। তারপর অস্থির হয়ে দুহাত ঘাড়ের পেছনে দিয়ে চেইনের হুক খুলে ফেলে হাতের তালুর ওপর ছোট্ট লকেটআলা হারটা রাখতেই একবারে স্থির হয়ে গেল। স্মৃতির ঘূর্ণি উল্টোদিকে বনবন করে ঘুরতে লাগলো। ওর মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় ওকে 'বাবু' বলে ডাকতো ওর ভাই। যেদিন ও ভাইকে হারিয়েছে সেদিন বাবু নামটাও হারিয়ে গেছে। আজ এ পরম মুহূর্তে কেন কীভাবে কোন প্রয়োজনে সেই হারিয়ে যাওয়া নামটা আবার ফিরে এলো স্বপ্নার নিশ্চল ঠাণ্ডা মুষ্ঠিবদ্ধ হাত থেকে তার কোন জবাব পাওয়া গেল না।

অষ্টমপ্রহর

স্টেশনে নেমেই দেখি মানুষজন ছুটছে একদিকে। চারদিনের কাঙালিভোজের আজ শেষদিন। কেউ জোরে হেঁটেও পেছনে পড়ে গেলে খানিকটা দৌড়ে গিয়ে পরিচিতদের সাথ ধরছে–

'ও বড়মা এট্টু আস্তে হাঁটদিনি। এ ন্যাটা কোলে কইরি কি হাঁটতি পারি?' কোলের ছেলেকে আরও একবার মাজার ওপর খেঁচে বসিয়ে পাড়ার নাড়া খাড়া চাচীদের সাথে পাল্লা দিয়ে আর পারে না পাশের গ্রামের অল্পবয়েসি বউটা। জোয়ান বুড়োরা লুঙ্গির কোচা তুলে পা চালাচ্ছে।

'ও ত্তাঐ, আজই কিন্তুক শ্যাষদিন। জম্মের দাবা দাবতি হবেনে বোলে'

'গ্যাদি খাতি গিয়ি আবার ন্যাদি ফেলিসনি যেন্'

'হয়। খাবো ঠ্যাসি, যায় যাবে ফাইসি'

'পুন্ন চাঁড়ালের দশা হলি আর ছামনে বচ্ছর সাঁটতি পারবিনিনি'।

কেউ খালি হাত দুদিকে ঝুলিয়ে ছুটছে, কারো বগলে থালা। কলার পাতার ব্যবস্থা আছে জেনেও আরাম করে খাবার জন্য বাড়ি থেকে রঙচটা গামলা, মাটির শানুক, কান্দাতোলা বড় মালসা নিয়ে হাজির হচ্ছে কোটিপতি পবনলালের মায়ের হরবছরের মৃত্যুবার্ষিকীতে আয়োজিত লঙ্গরখানায়। চারদিন ধরে টানা রান্নাবাড়া আর কাঙালিভোজ। রাতে হরিনাম–'ভজ গৌরাঙ্গ, জপ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম হে'। মানুষ বলে কাঙালিভোজ। কিন্তু পবনলালের শ্রী শ্রী হরেকৃষ্ণ মন্দিরে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের নাম আসলে অষ্টমপ্রহর। প্রতিরাতের অষ্টমপ্রহর পর্যন্ত ঢোল, খরতাল, কাঁসর আর ঘন্টা বাজিয়ে ঠাকুরের নাম নেয়া হয়।

পনের মিনিটের রাস্তা–মানুষের কাফেলা পেরিয়ে রিকশা করে বাড়ির সামনে নামতে লাগলো পয়তাল্লিশ মিনিট। দেখলাম আমাদের মফস্বল শহরের একমাত্র নির্লিঙ্গ আলোমতি পাগল একহাতে পাখা আর একহাতে সমতল বুকের ওপর ওড়না সামলাতে সামলাতে দ্রুত যাবার মুখে আমাকে দেখে থেমে গিয়ে–

'ও মা, মাইজি বু তুউ খপর পাইচিস? চ আমার সাথ, ধানকলের শানের ওপর বসি দেবোনে'–বলে আমার যাওয়া না যাওয়া তোয়াক্কা না করে তীরবেগে ছুটে চললো। ওর আসল নাম কী তা ওর মা ছাড়া আর কেউ জানে না। একবার স্বাধীনতার পরপর আমাদের শহরে 'আলোমতি ডালিমকুমার' যাত্রাপালা হয়েছিল। ঐ যাত্রাপালা দেখার পর সে অলোমতির মতো সাজতো আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেচে-কেঁদে আলোমতির সংলাপ আওড়াতো। সেই থেকে আলোমতি। সামান্য পয়সা বা ভরপেট খাবার বিনিময়ে মানুষজন ওকে দিয়ে অনেক কঠিন কাজ করিয়ে নিত। ওরও বয়স হয়েছে। চোখে স্পষ্ট ছানি।

দুই বছর পর বাড়ি আসছি। কত পরিবর্তন। সেই আব্বার মৃত্যুর সময় এসে দেখে গিয়েছিলাম বাড়ির গেটের বাঁ দিকে আব্বা একটা বোগেনভিলার চারা লাগিয়েছিল। একটা কাঠির সাথে অসচেতন রোগা পটকা কিশোরীর মতো নাছোড় শরীরকে সরু দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এখন পুরো ফটক জুড়ে তার ফাটাফাটি যৌবন। ঝুলে থাকা কচি কুন্তল হাত বাড়িয়ে সযত্নে সরিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই ছোটবোন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো। মা নামাজ শেষে তসবিহ চুমো খেতে গিয়ে আমার গালে ঠোঁট ছোঁয়ালো। টেবিলে হরেক পদের রান্না। মা'র তবুও মন ওঠেনি। ঠিকে ঝি এ চারদিন সময়ই দিতে পারেনি। পবনলালের মায়ের মৃত্যুবার্ষিকীর কাঙালিভোজ নিয়ে গরীব-দুখিরা কেউ আর কোন কাজে নেই। তবে আজই শেষ। বিকেলে যে যার ঘরে ফিরবে।

'আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন এই পবনলাল লোকটার তো নাম শুনিনি মা। এর এহেন উদয় হলো কবে?'

'তখনও ছিল। তবে ধনী হয়েছে কিছুকাল হলো। থাকে ঢাকায়। গুলশানে বিশাল বাড়ি। কেবল অষ্টমপ্রহরের সময় কালো কাঁচে ঘেরা আজদাহা গাড়িতে করে আসে'। মা চালকুমড়া দিয়ে রান্না ইলিশ মাছের মাখনের মতো পেটি পাতে তুলে দিতে দিতে বললো।

'জান মেজাপা এই পবনলালকে নিয়ে অনেক কাহিনী। সে নাকি দানবীর। তার কাছে হাত পাতলে কেউ খালি হাতে ফেরে না। কত গরীব মেধাবী ছেলেকে সব খরচ দিয়ে পড়ায়। তবে এ পর্যন্ত কেউ তাকে দেখেনি'। কলেজপড়ুয়া ছোটবোন চোখে দুনিয়ার বিস্ময় নিয়ে বললো। আজকাল মানুষের উল্টোপাল্টা কায়-কারবার দেখে দেখে মানুষের ভালো কাজকেও কেমন সন্দেহের চোখে দেখি। বললাম–

'নিশ্চয় ভোটে দাঁড়ানোর মতলব'।

দরজা ঠেলে হাতের থালা একদিকে ঝনাৎ করে রেখে ঠিকে ঝি আমেনা পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। খেয়েদেয়ে পেট এমন ভার যে আর নড়ার ক্ষমতা নেই। আমাকে আগে দেখেনি। কিন্তু কোন কৌতুহল নেই। মা জিজ্ঞাসা করলো–

'কিরে শেষ হলো আজ?'

'হয় চাচী। তেবে আইজ আর নড়তি পাইরবো না। যা করার কাইল। ও কিডা?'

'আমার মেজ মেয়ে। ঢাকা থেকে এসছে'। ঢাকার কথা শুনে আমেনা উঠে বসলো। কিজানি বকশিশ টকশিশ চাইতে গেলে ভালোমন্দ দুএকটা কথা তো বলতেই হয়। ঘাড়ের ওপর থেকে শাড়ির ছেঁড়া আঁচল কোলের উপর ফেলে ছেঁড়া অংশটায় হাত বুলাতে বুলাতে বললো–

'ইবার আর লুঙ্গি-কাপুড় দিলু না। জাগায় বইসি য্যাতো পারো খাও। বাড়ি বাইন্দি নিতি পারবানা। বচ্চরকার খাওয়া যদি খায়ি নিয়া যাইতু...'। আর বসে থাকতে পারলো না আমেনা। অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ করতে লাগলো।

'তাকে কি দেখেছ আমেনা কোনদিন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'গেল বচ্চর অষ্টমপওরে চাঁদনি রাতে আমার ছোট দেওর তাক দেইখছিলু'। তার গলায় অলৌকিক গল্প বলার আমেজ।

'দুধি-ই-ই-ইর মতন গার রোং। বুক তাকাত শাদা আ-আ ফকফকা দাড়ি। দুই মানুষ সুমান নাম্বা। শাদা আলখাল্লা পইরি খড়ম খটখটিয়ি বাগানের মদ্যি হাঁইটি বেড়াচ্ছিলু। আমার দেওরের চোকি চোক পড়তিই বোলে এক মুত্তুরি মিলি গেল!'

বুঝলাম পবনলালকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে নবী-রসুল, সাধু-সন্ন্যাসীদের মিথ। কিন্তু তারপর যখন আমেনা বললো–'ছামনে বার বাবাঠাকুর ভোটে দাঁড়াবে। ইবার খাতি দিবার সুমায় খাজিনদাররা বারেবার সেই কতাই বুলতিছিলু'।

যা আশঙ্কা করেছিলাম তা-ই। নিজের দূরদর্শীতায় নিজেই মুগ্ধ হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম–

'কিন্তু আমেনা, তাকে তো তোমরা কোনদিন দেখইনি। তাকে চিনবে কেমন করে?'

'ভোটের সুমায় আমাগের হাত দিয়িই তো ফটোআলা কাগজ দিয়ালে দিয়ালে সাঁটা লাগবেনে। আর না-ই দেকলাম তাক। আমরা তো সিল মারি মার্খায়'।

ভাবলাম তবুওতো প্রান্তিক মানুষ বছরে চারদিন পেটপুরে খেতে পাচ্ছে। এ চারদিনের আশায় অনেক বয়স্ক মানুষ বারবার আরও একবছর করে বাঁচতে চায়। আগের দিনে ঈদে বা দূর্গাপুজায় মেয়ে-জামাইকে নাইয়োরে আনতো এ এলাকার মা-চাচীরা। নাইয়োরে আসা-যাওয়ার রাহাখরচ, মেয়ে-জামাই-নাতি নাতনিদের জন্য নতুন কাপড়, দশ-বারোদিনের বাড়তি খাওয়া, পিঠে-আটা, জামাইয়ের জন্য ভাজা-পোড়া, ঈদ বা বিজয়ার আড়ঙে নাতিপুতিদের হাতে খুচরো পয়সা–এ আক্রার দিনে বড়লোক ছাড়া কে আর পারে? তো বাবাঠাকুরের দেয়া বচ্ছরান্তের ভোজ এখন সেসব মানুষের কাছে পার্বনের বড় পার্বন। মেয়ে-জামাইরা এখন দূরগ্রাম থেকে নিজেরাই লোকাল বাসে চলে এসে সরাসরি ভোজে বসে যায়। মা-বাপের ওপর জুলুম নেই। কেবল রাত ক'টা ঠেলেগুঁজে কাবার করা। চারদিন পর যে যার ঠিকানায়। কিন্তু ঐ চারদিন হাটে আসা মানুষের পায়ে গু না মাখিয়ে বাড়ি ফেরার কায়দা নেই। যেখানে পা সেখানেই গু। কারো কারো বেশি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনাও বিরল নয়।

পূর্ণ চাঁড়ালের গল্প তো সবার মুখে মুখে। পবনলালের মায়ের শ্রাদ্ধে পাঁচ ক্রোশ দূরের গ্রাম গোলাপনগরের পূর্ণ চাঁড়াল শুনতে পেল কাঙালিভোজের খবর। যেদিন শ্রাদ্ধ তার তিনদিন আগে থেকে সে পেট খালি রাখতে শুরু করলো। শ্রাদ্ধের দিন পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে রাজ্যের ক্ষুধা নিয়ে সে লাইনের মাঝখানে পাত পাড়ার স্বপ্ন নিয়ে এগুলো। লাইনের মাঝে বসার অনেক লাভ। দুদিক থেকে আসা খাজিনদারের দুদফা খাবার তার পাতে পড়তে পারে। কিন্তু ক্ষুধার দুর্বলতার কারণে আসতে দেরি হওয়ায় মাঝখানে জায়গা না পেয়ে মনের দুঃখে একপাশেই বসতে হলো। দুপুর থেকে বিকেল নাগাদ টানা খেয়ে চললো। একেবারে নাক অব্দি খেয়েও মাঝখানে বসার খেদ তার মিটলো না। ভারি পেট নিয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে বাড়ির পথ ধরলো। খানিক হাঁটে আবার বসে। কলিমউদ্দিন মোল্লা ব্রিজের গোড়ায় এসে একেবার থেবড়িয়ে বসে পড়লো। আর পা চলে না। সন্ধ্যার আলোছায়ায় খানিক দূরেই দেখতে পেল একটা মরা গরু বিশাল মোটা ঢাকের মতো পেট নিয়ে পড়ে আছে। পূর্ণ চাঁড়ালের সবকিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। ওর মনে হলো–ও শালা নিশ্চয় লাইনের মাঝখানে বসেছিল। আরও একটু সামনেই

ফজরালি ব্রিজের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই পূর্ণ চাঁড়াল আর এগুতে পারলো না। মাঝখানে বসার অতৃপ্তি নিয়ে মাটির কোলে ঢলে পড়লো।

এরপর ১/১১ এর পট পরিবর্তন। ফুটপাত থেকে হকারদের উচ্ছেদ করে হলিডে মার্কেটের নতুন ধারণা। সরকারি অংশে স্থাপনার বাড়তি ছাউনি ভেঙে দিয়ে আইনমাফিক করার চেষ্টা। বিডিআর দিয়ে খেলার মাঠে অস্থায়ী স্থাপনা বসিয়ে নায্যমূল্যে চাল, তেল, চিনি বিক্রি। অবৈধ সম্পদের হিসাব নিকাশ। রাজনীতিবিদদের জেলে প্রেরণ। দুর্নীতিবাজদের ধরপাকড়। চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে অভিযান। এমনকি আমাদের বৃহত্তর কুষ্টিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামগলো থেকে 'রাইতপার্টি'র দৌরাত্মও কমে এলো। যেখানে সন্ধ্যের পরপরই সবাই ঘরে ফিরে বাড়ির দরজা লাগিয়ে দিত সেখানে রাতবিরাতে দোকানে আড্ডা দিয়ে গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ি ফিরতে লাগলো মানুষজন। দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে যতক্ষণ না বুড়ো আঙুল দেখালো ততক্ষণ সবকিছু ঠিকঠাক।

ছোটবোনের পরীক্ষা শেষ হলে মাকে আর ওকে আনতে ঢাকা থেকে বছরখানেক বাদে আবার বাড়ি গেলাম। আমি আসলে বাড়ি যাওয়ার জন্য ছুঁতো খুঁজি। পৃথিবীর কোন দেশ আমার মফস্বল শহরের মতো নয়। সমতল থেকে এতো উঁচুতে স্টেশন কেবল আমার শহরেই আছে। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে কাঁধে হালকা ব্যাগ ফেলে নিচের রাস্তায় নামছিলাম। পেসাবের গন্ধ। চোখ বন্ধ করে সেই গন্ধ নিলাম। যেন ফরাসি সুবাস। আমার শৈশব, আমার কৈশোর এসব গন্ধের মধ্যে থেকে মাথা উঁচু করে একপলক দেখে নিল আমাকে। আশেপাশেই আমার আঞ্চলিক ভাষায় মাটির টান। কী সহজে বুঝি সবকিছু–

'ইবার ব্যবসা কইরি মজা মাইরি নিলি গনি ভাই। চাঁদার ঠাপে আর পড়তি হইলু না'

'হ, এতোকাল তো লাভের গুড় ঐ সুমুন্দির পিঁপড়িতিই খাইতু'

'বই দেইকি আইস্‌লে নাকি? জবর বই চলচে বোলে বর্ণালীতে?'

'নক্ কইর থাক। বুলিসনি। তোর ভাবী শুনলি থোবে নানে'

'থালি পরে ফ্যালো দশট্যাকার একখান কচ্‌কইচি লোট। আমু শালার বিলাতি ধুমু গিলি'।

মানুষের মনে একটু স্বস্তি। ঘাটে ঘাটে চাঁদাবাজি নেই। বাজার থেকে ফেরার পথে আচমকা কেউ গা ঘেঁষে এসে পেটে ঠাণ্ডা ঠেকায় না। একবেলা খায় তা-ও ভালো জান নিয়ে তো টানাটানি নেই।

উপজেলা কমপ্লেক্সের পাশ দিয়ে রিকশা করে বাড়ি যাচ্ছি। এক জায়গায় খানিকটা জটলা দেখলাম। আমাদের অঞ্চলের একমাত্র নির্লিঙ্গ আলোমতি জটলার মধ্যে খুব ব্যস্ত। রিকশাআলা কিশোরটি আমার কৌতুহল বুঝে নিয়ে জটলার পাশ দিয়ে রিকশা

ঘুরালো। দেখতে পেলাম আলোমতিকে দিয়ে দেয়ালে পোস্টার লাগাচ্ছে লোকজন। 'একে ধরিয়ে দিন' লেখা পোস্টারের নিচে কোট-টাই পরা চকচকে টাকের মোটা গোঁফআলা এক অভিজাত ভদ্রলোকের ছবি। মানুষের মাথার ভিড়ে ছবির নিচে লেখা মোস্ট ওয়ান্টেটের নামটা পড়া গেল না। বাড়ি ফিরে মায়ের সাথে রাজ্যের গল্প করে অনেক রাতে খাবার নিয়ে টিভির সামনে বসে খবর দেখছি। স্ক্রলে বিশেষ সংবাদ পিলপিল সরে যাচ্ছে–'দেশের একনম্বর চোরাকারবারি পবনলাল আগরওয়াল বেনাপোল বর্ডার দিয়ে পালানোর সময় স্বস্ত্রীক ধৃত'।

অনেক রাত। অষ্টমপ্রহর কিনা কে জানে?

আলো আছে আলো নেই

আমার সাথে আমার মেজআপা অর্থাৎ আমার বড়চাচার মেজমেয়ে শেলি আপার বয়সের ঢের তফাত। প্রায় মা-মেয়ের বয়সের পার্থক্য। সতেরো বছরের ছোট আমি। অবশ্য আপার বিয়েও হয়েছিল একটু বেশি বয়সে। কিন্তু আপা আমাকেই সব দায় দায়িত্ব দিয়েছে। তার গড়া 'শিশুবিকাশ সংঘ'-এর বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক আমি। আপা প্রতি দুবছর পরপর আমেরিকা থেকে ফান্ড নিয়ে আসে। আমার কাজে সে খুবই সন্তুষ্ট। আমাকে তার এ কাজ দেয়ার পেছনে অবশ্য একটা ইতিহাস আছে। তার দেবরের সাথে ছিল আমার গভীর প্রণয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক মেজ দুলাভাই উচ্চশিক্ষার জন্য যখন আমেরিকা চলে গেল তখন দুই বিচ্ছু নিয়ে আপার ল্যাজে-গোবরে অবস্থা। দীর্ঘ বিরতির পর আপা রাষ্টবিজ্ঞানে এম এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। আমি তখন গ্রাম থেকে ভালো রেজাল্ট করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া অবাকবিস্মিত নারী। আপার বাসায় থেকে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে মনুজান হলে গিয়ে উঠলাম। আপার দেবর তখন রসায়নে অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। শেরে বাংলা হলে থাকে। আমার ভর্তি পরীক্ষার জন্য সে আপার অনুরোধে বাসায় এসে আমাকে রবীন্দ্র কলাভবনে নিয়ে গেল। বাসা থেকে খুব দূরে নয় কলাভবন। কিন্তু সে রিকশা নিল। আমি জড়োসড়ো হয়ে বসলাম। সে নির্দ্বিধায় আমার ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়ে হুড উঠিয়ে দিয়ে ঘাড় থেকে আর হাত নামালো না। দেখলাম যাওয়ার পথে গাছতলায়, কোরিডোরে, সিঁড়িতে ছেলেমেয়েরা ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। আমাদের মফস্বল শহরের কলেজে একবার লাইব্রেরির পেছনে আমার অবস্থান থেকে দেড়হাত দূরে দাঁড়িয়ে উপরের ক্লাসের এক ছেলে আমাকে নোট দিয়েছিল। টিচারর্স রুমের জানালা দিয়ে আমাদের ইসলামের ইতিহাসের মমিন স্যার যাকে আমরা আড়ালে পিকে হিট্টি বলতাম সে আব্বার কাছে নালিশ করেছিল আমি নাকি ক্লাসের বাইরে ছেলেদের সাথে আড্ডা দেই। আব্বা সাফ জানিয়ে দিয়েছিল আর কোন নালিশ এলে লেখাপড়া বন্ধ। সেই আমি আপার দেবরের বাহুবেষ্টনীর মধ্যে থিরথির কাঁপতে কাঁপতে কলাভবনে যেতে থাকলাম। থামের আড়ালে দেখলাম একটা মেয়ের চোখে পানি। গায়ে লেগে থাকা ছেলেটি মেয়েটির হাতের তালুর ওপর আঙুল দিয়ে হিজিবিজি কাটছে। কোরিডোরের খাটো দেয়ালে পাশাপাশি পা ঝুলিয়ে বসে একটা মেয়ে পাশের ছেলেটিকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিচ্ছে আর হেসে কুটিকুটি। ছেলেটা পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিচ্ছে। একটু দূরে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে নীল শাড়ি পরা সুন্দরী। ছেলেটি ঘাসে কাত হয়ে শুয়ে ঘাস ছিঁড়ে মেয়েটির খোলা পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। আপার দেবর উত্তেজনাহীন কণ্ঠে বললো–

'এর নাম বিশ্ববিদ্যালয়। কদিন পর তোমাকেও ঐ আমগাছের নিচে কারো ঘাড়ে মাথা দিয়ে বসে থাকতে দেখা যাবে'

'ছি! আমি মোটেও ওরকম হবো না'
'আরো বছর দুয়েক আছি। দেখাই যাবে'।

তিনমাসের মাথায় আপার দেবর বিপ্লবের ঘাড়ে মাথা দিয়ে নির্জন লাইব্রেরির পেছনে দুপুর পার করতে লাগলাম। সন্ধ্যায় হলের গেট বন্ধ হওয়ার আগে দিনের ছাড়াছাড়ি। আপা টের পেয়েছিল।

'বিপু কিন্তু সুবিধের না। সুবিধাবাদী। আগেও তিনটে মেয়ের সাথে ওর সম্পর্ক ছিল। সাবধানে থাকিস'।

আমার প্রথম প্রেম, আমার বিশ্বাস, আমার ব্যাকুলতা, আমার নির্ভরতা বিপ্লবকে অস্বীকার করার সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপরই বিপ্লব একটা এনজিওতে চাকরি পেল। আমার সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার পর বিনোদপুর বাজারের কাজি অফিসে গিয়ে বিয়ে করলাম। আব্বা আমার সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলো। কারণ বিপ্লবকে আব্বার একটুও পছন্দ ছিল না। আমার পেটে ভবিষ্যত রেখে বিপু আমেরিকা চলে গেল। সেই গেল আর কোনদিন ফিরলো না। মেজআপার ভবিষ্যতবাণী ততদিনে আলোর মুখ দেখলো। সুবিধাবাদীদের ওপর ঘেন্নায় ছেলেকে নিয়ে স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি করে একাই জীবন কাটাতে লাগলাম। মেজআপার আমেরিকাবাসও হয়ে গেল দুই যুগ। অবহেলিত বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে আপার উদ্যোগে 'শিশুবিকাশ সংঘ'এ যুক্ত হয়ে গভীরভাবে একাত্মতা অনুভব করলাম। প্রতিটি শিশুর মুখ আমার সন্তানের মুখ। বাবার স্নেহবঞ্চিত মুখগুলোতে স্বপ্ন দেখানোর হাতেখড়ি দিতে লাগলাম। বাবাকে নিয়ে আমার ছেলের প্রশ্ন করার বয়সও শেষ হলো।

আপার উচ্চশিক্ষিত দুই ছেলে আমেরিকায় ভালো চাকরি করে। একজনের বিয়ে ভেঙে গেছে একবছরের মাথায়। আরেক ছেলে একজন আইরিশ মেয়ের সাথে সহাবস্থান করে। অসুস্থ দুলাভাইকে নিয়ে সিনিয়র সিটিজেন আপা দেশে ফিরে এলো। বিপ্লবের সাথে আপার দেখা হয়েছে। ও নাকি বলেছে ছেলে ওর না। কামেলা পার্কার মার্কা এক ধনবতী ইটালিয়ান বুড়িকে বিয়ে করে সুখে আছে। আমি একটুও অবাক হয়নি। আপা আরেকবার পুনরাবৃত্তি করলো 'এসব সুবিধাবাদীদের পাল্লায় পড়তে তখনই সাবধান করেছিলাম...'

আমার স্কুল, সন্তান আর শিশুকেন্দ্র নিয়ে আমার কোন ফুরসৎ নেই। আমি কারো জন্যে কপাল চাপড়ায় না। আপার দেয়া দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করি। আসলে কাজটাকে আমি ভালোবাসি। ছেলে আমাকে বোঝে। সবার সংসারই রান্না করে, ঘর গুছিয়ে, স্বামীর ঘরে ফেরার অপেক্ষা করে, রাতের কর্তব্য করে কাটাতে হবে–এ প্রথায় আমার বিশ্বাস নেই। শিশুদের সাথে থাকা, তাদের অদ্ভুত আচরণের সঙ্গী হওয়া, তাদের অসহায় কচি মুখ বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা, একটু একটু করে তাদের বাড়তে দেখা– এইতো আমার সংসার। আপা অবশ্য ভাবে এ আমার অভিমান, ক্ষোভ, নিজকে সান্ত্বনা দেবার বাহানা। তবুও আপার সদিচ্ছার জন্যই তো সমাজে এতবড় কাজটা হচ্ছে। প্রায় অর্ধশতাধিক উপেক্ষিত শিশু খুঁজে পেয়েছে নিরাপদ আশ্রয়, খাদ্য, স্নেহ, প্রাথমিক শিক্ষা। আপা দেশে ফিরে আসাতে আমি শিশুদের মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আরও সমৃদ্ধ

হলাম। আপার এ বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ আছে। আপা ঢাকায় নারীদের আইনি অধিকার নিয়েও কাজ শুরু করেছে। আমাদের উপজেলা শহরে শিশুবিকাশ সংঘের পুরো দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে আপা খুবই সন্তুষ্ট।

বনানীর নিজস্ব ফ্ল্যাটে অসুস্থ প্রায় বাকশক্তিহীন চলঃশক্তিহীন দুলাভাইকে নিয়ে আপার ব্যস্ত জীবন। আপার বন্ধু বান্ধবের সংখ্যাও কম নয়। সপ্তাহান্তে আপার বাসায় আড্ডা খাওয়া-দাওয়া হয়। ছেলেরা মাঝে মধ্যেই বাবাকে দেখতে আসে। আপাকেও বছরে একবার করে আমেরিকায় যেতে হয় অবসরভাতা আনার জন্য। ভাগ্যিস সালেহা ছিল। দুলাভায়ের খাওয়া-দাওয়া, দেখাশুনা সালেহাকেই করতে হয়। আমিই সালেহাকে দিয়েছিলাম। যৌতুকের জন্য তালাকপ্রাপ্ত অসহায় সালেহাকে শিশুবিকাশে কাজে লাগিয়েছিলাম। আপা সালেহার কর্মনিষ্ঠতায় মুগ্ধ হয়ে দুলাভায়ের সেবাযত্নের জন্য নিয়ে গেল। দুলাভাইও এখন একপ্রকার শিশুই। নিজের কোন কাজ তো আর নিজে করতে পারেন না। কিন্তু অল্পবয়েসি সালেহার সংসার আর স্বামীসঙ্গের সাধ মেটেনি। দুলাভাইকে সালেহার জিম্মায় রেখে আপা একমাস পর বাসায় ফিরে দেখে সবকিছু সুন্দর গোছালো। দুলাভাইও আশাতিরিক্ত সুস্থ। কোথাও কোন অনিয়ম নেই। আপা খুশি হয়ে আমেরিকা থেকে সালেহার জন্য আনা নির্ধারিত কসমেটিকস-এর সাথে এটা ওটা বাড়িয়ে আরো বেশি কিছু দিল। সালেহা মিনমিন করে বললো–

'এই গুনুতেই হয়্যি যাবেনে। খালি একখান নাল শাড়ি। ও আপা আপনি অমত কইরেন না'

'মানে কী?' আপার বুকের মধ্যে কীসের ভয় যেন উঠানামা করতে লাগলো। একবার দুলাভায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলো চোখ বুজে আছে আগের মতোই। ভান করছে নাকি? মেয়েটা অবশ্য সরাসরি কথা বলে। কী বলতে চায় মেয়েটা? আপা একনিমেষে দেখতে পেল লাল শাড়ি পরা সালেহাকে জড়িয়ে ধরে তার স্বামী দিব্যি শুয়ে আছে। স্বামী তার ইতিউতি হাত চালাচ্ছে। একবছর বাকশক্তি রহিত হওয়া স্বামী যেন সালেহার কানে কানে বলছে–

'বউ তুই খুব সুন্দর। আবার নতুন করে সংসার করতে ইচ্ছে করে'। নিজের কদিন না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়িয়ালা গালে হাত বুলিয়ে বলে 'খৈনি করবো'। আসলে ঝিমুতে থাকা বাহাত্তুরে স্বামীর মুখটার সাথে কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা'র সেই ঘাটের মড়া বুড়োর মিল খুঁজে পায় আপা। সালেহা শরম টরমের ধার না ধেরে বলেই ফেলে–

'ছইদি আরবে যাওয়ার আগেই মজিদ মিয়া নিকি করতি চায় আমাক। আপনাগের দারোয়ান।'

বুড়ো স্বামীকে ততক্ষণে ফেরেশতার মতো দেখতে লাগছে আপার। যেন জগদ্দল পাথর নেমে গেল বুক থেকে। মনে হচ্ছে সালেহা যা চাইবে আপা তা-ই দিতে পারবে। গদগদ হয়ে বললো–

'কবে করতে চায়? সৌদি যাওয়ার টাকা পয়সা জোগাড় হয়েছে?' আপা বুঝেই নিল সৌদি যাওয়ার টাকা পয়সা জোগাড়ের জন্যই মজিদ মিয়ার এহেন প্রস্তাব। দেয়া যেতেই পারে। সালেহা যেভাবে অসুস্থ মানুষটাকে দেখছে তার প্রতিদান হিসেবে এ টাকাটা

আপার দেয়াই উচিৎ। তাছাড়াও মজিদ মিয়া তো আর বিয়ে করে গ্রামের বাড়ি ফেলে আসতে চাইবে না সালেহাকে। বরং মজিদ মিয়া সৌদি গেলে সালেহার এ বাসায় থাকা নিশ্চিত।

'সবই রেডি গো আপা। ভিসা হলিই চইলি যাবে'–বলে সালেহা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ও, তাহলে খাঁটি প্রেম। কিন্তু বিয়ে করে যদি গ্রামে রেখে আসে সালেহাকে? কে দেখবে দুলাভাইকে? আপাই বা কেমন করে এতো কাজ করবে? তাছাড়া বছর বছর স্বামীকে রেখে আমেরিকায় যেতে হবে না?

'ওর বাড়ি কোথায়? কে কে আছে?'

'উর তিরিকুলি কেউ নি। ছেইলি বিয়াতি গেলি বো মরে। এট্টা বাইচ্চার খুব হাউশ'।

যাক। সালেহা তাহলে এখানেই থাকবে। আপা নিশ্চিত।

বাসাতেই ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সালেহার বিয়ে হলো। আমিও ছিলাম। আপা গয়নাগাটি দিয়ে সালেহাকে সাজিয়ে দিল। সালেহা আসলেই সুন্দরী। আপার ছেলেরা সালেহার জন্য অনেক উপহার পাঠালো। মজিদ মিয়াকে দেখেই মনে হলো এ লোকটার দ্বারা কারো উপকার ছাড়া অপকার হবে না। নির্ভরতার কোমল ছাপ দুটো চোখ জুড়ে। এ চোখ বিপ্লবের চোখ নয়। যৌতুক, টাকা-পয়সার শর্ত ছাড়াই মজিদ মিয়া সালেহাকে বিয়ে করছে দেখে আপা একটা ভালো অংকের টাকা সালেহার একাউন্টে জমা রাখলো। আপার সার্ভেন্টস রুমে সালেহার বাসর হলো। সালেহা নাম ধরে ধরে আমার কাছে শিশুবিকাশের শিশুদের খোঁজখবর নিল। মিতুর পা কেটে গিয়েছিল, সেরেছে কি না, সাব্বির 'আমপাতা জোড়া জোড়া' ছড়াটার পুরোটা মুখস্ত করতে পেরেছে কি না, নাইমা নিজ হাতে খেতে পারছে কি না–এসব। একবার মজিদ মিয়াকে নিয়ে কেন্দ্রে যেতে চাইলো সে। আসলে সালেহার মতো একজন মমতাময়ীর খুব দরকার কেন্দ্রে। কিন্তু সালেহা ছাড়া আপার সব অন্ধকার। আপা একদিনও সালেহার অনুপস্থিতি বরদাস্ত করবে না। মজিদ মিয়া মেস ছেড়ে আপার বাসাতেই রাত্রিযাপন করতে লাগলো। দুলাভাইকে কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় দেয়া, হুইল চেয়ারে বসানো, বাইরে ঘুরিয়ে আনার দায়িত্ব মজিদ মিয়া সানন্দে গ্রহণ করলো। সালেহা আরো মনোযোগী হলো রান্নবান্না আর সংসারের কাজে। মজিদ মিয়ার সোহাগে সালেহার রূপ দল মেলতে লাগলো।

বিয়ের দুমাসের মাথায় মজিদ মিয়ার ভিসা হলো। সালেহা কেঁদে কেটে অস্থির। মজিদ মিয়া সন্তানের মতো সান্ত্বনা দেয়। দুবছর বাদেই সে ফিরে আসবে। আর যাবে না। কেবল এতোগুলো টাকা খরচ করেছে বিদেশ যাওয়ার জন্য বলেই সে যাচ্ছে। না হলে সালেহাকে ছেড়ে যেতে তারও তো বুক ভেঙে খান খান। আপার পায়ে সালাম করে মজিদ মিয়া বিনীত কণ্ঠে বলে গেল–

'আপা উক্ দেইকি রাকপেন। উরউ দুনিয়াত্ আমি ছাড়া কেউ নি, আমারউ ও ছাড়া...'। মজিদের গলা ধরে এলো।

'কোন চিন্তা করো না মজিদ মিয়া। টেলিফোনে কথা বোলো। আমরাতো আছিই'।

আপা গাড়ি দিয়ে মজিদ মিয়াকে বিমানবন্দরে পাঠালো। সাথে সি-অফ করতে সালেহা গেল। বাসায় ফিরে এসে সালেহার কান্না আর থামতে চায় না। নিজের বিছানায়

শুয়ে শুয়ে কাটলো সালেহার সারাদিন। ওর মনের অবস্থা বুঝে আপা নিজেই ঘরের কাজসহ দুলাভায়ের দেখাশুনা করতে গিয়ে একদিনেই কাহিল। পরের দিন থেকে সালেহা কাজে লাগলেও আপা লক্ষ্য করলো ও বারবার আনমনা হয়ে যাচ্ছে। সময়ের কাজ সময়ে হচ্ছে না। চারদিন পর আপা ভারতে নিজের চেক আপের জন্য যাবে। সালেহার নিরাসক্ত ভাব দেখে আপা ভয়ই পেল।

'স্বামীর জন্যে এতো ভেঙে পড়লে চলবে? তোকে ভালো রাখার জন্যেই তো কষ্ট করতে গেল। দেখতে দেখতে দুবছর ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে দেখিস'

'আমার কিরাম ফাঁপড় ঠেকছে। কুনু কাজ করতি মন বোলছে না'

'ইন্ডিয়া থেকে ঘুরে আসি। তোকে শিশুবিকাশে নিয়ে যাবো। বাচ্চাদের মধ্যে গেলে তোর ভালো লাগবে'।

আপা পঁচিশ দিন পর ফিরলো। আমি রোজই একবার করে সালেহার সাথে কথা বলেছি। দুলাভায়ের শরীর আরও খারাপ হয়েছে।

আপা ফিরে সেই আগের মতো গোছালো বাসা দেখতে পেল না। সালেহার সারা-মুখে ক্লান্তির ছাপ। কাজকর্মে শ্লথ গতি। দুলাভায়ের একহাত একটু সচল ছিল। ওটাও এবার এসে আপা কোলের ওপর পড়ে থাকতে দেখলো। পাতলা চুলগুলো আঠা আঠা। কতদিন শ্যাম্পু হয়নি কে জানে? দুলাভায়ের মাথাটা বুকে চেপে ধরে আপা জিজ্ঞাসা করলো–

'বেশি খারাপ লাগছে?'

দুলাভাই চোখ বন্ধ করে ঘাড় নাড়ে।

'আমাকে মিস করেছ?'

চোখ বন্ধ। হ্যাঁ সূচক ঘাড় নাড়া। চোখের কোল বেয়ে পানির ধারা বলিরেখা ধরে বক্রপথে ধায়। আপা গভীর মমতায় চোখ মুছে দিয়ে গায়ের ফতুয়া পাল্টে দেয়। নরোম ব্রাশে শ্যাম্পু মাখিয়ে মাথা ধুয়ে দেয়। নিজ হাতে নিজে হা করে করে দুলাভায়ের ঈষদোন্মুক্ত মুখের মধ্যে খাবারের চামচ তুলে দেয়। শেষ চামচটা আর চাচ্ছিল না বুঝতে পেরেও আপা জোর করে খাওয়াতে গেলে দুলাভাই উগরে দেয়। সালেহাকে ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে খুঁজতে গিয়ে দেখে সালেহা কমোডের সামনে দাঁড়িয়ে বমি করছে। আপার আর বুঝতে বাকি থাকে না। মজিদ মিয়ার ভবিষ্যত জানান দিচ্ছে। আর এ কারণেই বাসার এ হাল। ভারতে যাওয়ার আগেই সালেহার চেহারা দেখে আপার বোঝা উচিৎ ছিল। কিন্তু আপার তো মাথায় হাত। দুলাভায়ের শরীরের এ অবস্থা, ছোটছেলে যে মেয়েটির সাথে সহাবস্থান করতো তার বাচ্চা হবে। ছেলের উপুর্যপরি অনুরোধে আপাকে এ মাসেই আমেরিকা যেতে হবে। একমাত্র ভরসা সালেহা। সালেহার পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে আপা হিসেব কষে। ওর শরীরের এ অবস্থায় দুলাভাই, সংসারের ভার ওর ওপর দিয়ে চলে গেলে ফিরে এসে আর দুলাভাইকে পাওয়া যাবে না। এমন কোন বিশ্বাসী লোকও হাতের কাছে নেই যে তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যাবে। আপার সারারাত নির্ঘুম কাটলো। নিজের সাথে অনেক বোঝাপড়া করে সকালে উঠে সালেহাকে ডাকলো–

'শোন সালেহা আমাকে তো আবার আমেরিকা যেতে হবে। তোর শরীরের অবস্থাও তো ভালো না, তোর দুলাভাইও অসুস্থ'

'আমার কিছুই ভাল্ ঠেকে না আপাগো। খাতি পারিনি। গোন্দো, সব গোন্দো। সে তো পেত্যেক হপ্তায় ফোনে ফোনে কতো নলোপতো করে। সুংসারের কিছুই দেকতি পারিনি। দুলুভায়ের যত্নআত্তিও হচ্চে না। আপনার কষ্ট দেইকি বুক ফাইটি যায়'

আপা স্বস্তি পায়। যাক, তাহলে বাচ্চা টাচ্চার ঝামেলা সালেহাও চাচ্ছে না মনে হয়। সাহস করে এইবেলা বলেই ফেলে–

'মজিদ মিয়ার আসতে আসতে দুবছর। আবার বেশিও হতে পারে। একা একা বাচ্চা সামলানো খুব ঝক্কি। জোর করবো না। তবে তুই চাইলে এ বাচ্চা নাও রাখতে পারিস'

'ও আপাগো!'–সালেহা আর্তনাদ করে ওঠে। 'তার এট্টা বাইচ্চার খুব হাউশ। মরা ছেইলির মুখ সে ভুলতি পারে না। সে বোলে দুইসেট জামা কিনি রাইকিচে। আমু এট্টা সুন্তান চাই গো আপা'।

আপা মরিয়া হয়ে ওঠে–'বাচ্চা কে না ভালোবাসে বল্? কিন্তু তোর শরীরের যা অবস্থা আমি বাসায় না থাকলে তোর নিজের যত্ন তো হবেই না, কিছুই হবে না। বরং মজিদ মিয়া ফিরুক। সেসময় বাচ্চা নিলে সে তোর দেখাশুনা আদর আহ্লাদ করতে পারবে। বাচ্চাটা তার চোখের সামনে হলে সে বাচ্চার সোহাগই আলাদা। এসে যদি দুতিন বছরের বাচ্চা দেখে সে বাচ্চার ওপর কোন মায়া বসবে তার? ভেবে দেখ। তাছাড়া এক বাচ্চার মা হয়ে গেলে তোর চেহারাটাও তো এরকম সুন্দর থাকবে না।'

সালেহা কী ভেবে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর মিনমিন করে নিমরাজি গলায় বলে–

'সে ফোন করলি কী বুইলি বুজাবো তাক্?'

'এতো পানির মত সোজা। বলে দিবি বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলি। বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেছে'।

ড্রাইভারকে দুলাভায়ের কাছে বসিয়ে রেখে রিকশা করে আপা সালেহাকে নিয়ে ক্লিনিকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তখন সন্ধ্যা। সে আলোতে ভালো করে মুখ দেখা যাচ্ছে না। এবড়ো থেবড়ো রাস্তায় রিকশার আওয়াজের সাথে সালেহার নিমোচ্চারিত কান্নার স্বর আপার কানে পৌঁছালেও আপা ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে তা কেবলই রিকশার আওয়াজ হিসেবে মেনে নিতে নিজকে বাধ্য করে। সালেহার চোখের পানি পড়ে বুকের ওপরের শাড়ি ভিজে ওঠে। শা শা বাতাসে শাড়ির ভেজা অংশ থেকে বুকের ওপরটায় ঠাণ্ডা অনুভূত হলেও ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যায় সালেহার। রিকশার বড় ঝাঁকুনির সময় সালেহা বাঁ হাত দিয়ে তলপেট চেপে ধরে। ওর অন্তর্গত কান্নার কাঁপন ওঠে শরীরে। আপা পেছনে হাত ঘুরিয়ে ওকে নিজের শরীরের দিকে টেনে নেবার সময় সে কাঁপনকে রিকশার দুলে ওঠার সাথে গুলিয়ে ফেলে। এসি গাড়ির মধ্যে কৃত্রিম হাওয়ায় বসে থাকার চেয়ে রিকশায় বসে প্রকৃতির ফুরফুরে বাতাস খাওয়া অনেক মজার, আপা ভাবে।

অপাত্য যৌবনে

সাহেদ মারা যাবার আগে মেহরিন কোনদিন ভাবেনি সংসারটা এতটা জটিল। সাহেদ ঈগলের মতো পক্ষ বিস্তার করে মেহরিন আর ওদের একমাত্র অসুস্থ সন্তান পানসিকে আগলে রেখেছিল সকল ঝড় ঝাপটা নিজের পিঠে রেখে। মেহরিন-এর চাওয়ার আগেই বাসাটাকে আধুনিক অনুষঙ্গে ভরে তুলেছিল কেবল প্রয়োজনেই নয়–গভীর ভালোবেসেও। যেন মেহরিন আর পানসি ওর দুটো সন্তান। পানসি দশদিন ভালো থাকে তো বিশদিন বিবর্ণ। ভালো থাকার ক'টা মেহরিনের পৃথিবী উজ্জ্বল, পায়ে অদৃশ ঘুঙুর, ঘরের চারকোণে নিঃশব্দ সংগীত। সাহেদের স্বস্তি। স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে অফুরান আনন্দের বন্যা। মনে হয় পানসি একেবারে ভালো হয়ে উঠেছে। আর কোনদিন ও ফ্যাকাশে ঠোঁট আর গরম নিশ্বাস নিয়ে ওদের ফের হতাশার মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে না। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে থলে থলে রক্ত শরীরে ঢুকিয়ে আর ওকে রক্তিম করতে হবে না। কিন্তু আবার যে কে সেই। একগাদা পুতুলের মধ্যে মেয়ে সন্ধ্যার সময় শুয়ে আছে। রান্নাঘর থেকে ফিরে মেহরিন চমকে ওঠে। না না সন্ধ্যার আলো মুখে পড়ায় ওরকম হলুদাভ লাগছে। আসলে পানসি ভালো আছে। কিন্তু গায়ে হাত দিয়ে দেখতেও ভয় পায় । যদি দেখে গা গরম। তার মানে আবার বিশ-পঁচিশ দিন মেয়েকে নিয়ে মেহরিনের সেই নিরানন্দ জীবন। সাহেদ অফিস থেকে ফিরলে মেহরিন খানিকটা ভারমুক্ত হয়। সাহেদ মেয়ের সেবার সব দায়িত্ব নিজের ওপর টেনে নেয়। এভাবে আট বছর নিরবে যাবতীয় ভার বুকে বয়ে বেড়াতে বেড়াতে একদিন অফিস থেকে ফেরার মুখে সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে নিজেই ভেঙে পড়ে। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সের বিনয়ী কম কথাবলা কাজপাগল স্ত্রী-কন্যাঅন্তপ্রাণ সাহেদ মাহমুদ সিঁড়ির মধ্যেই শক্ত হয়ে গিয়েছিল।

আট বছরের পানসিকে নিয়ে মেহরিন অথৈ সাগরে। বাবাহারা মেয়েটি যেন বোবা পাথর। মেহরিন তো জানেই না কীভাবে সংসারের চারকোন গুছিয়ে চলতে হয়। সাহেদের ভেতর ও প্রতিনিয়ত দেখতে পেয়েছে একজন পিতাকে। এক ছায়াময় বটবৃক্ষের উপস্থিতি। ওর আর পানসির ওপর একই ছায়া। যে মেহরিন মেয়ের সুস্থতার দিনগুলিতে নিজেকে দেখতো ছোটবেলার কুমার নদের ধার ঘেষে হাঁটা এক কিশোরী। তার চুল উড়ছে, ওড়না উড়ে গিয়ে বাবলার ডালে আটকাচ্ছে, স্কুল থেকে ফেরার পথে হঠাৎ বৃষ্টি। তার পাশে আচমকা ছাতা মেলে ধরা কাঁপন জাগানো পুরুষালি গন্ধ। ছুটে পালাতে গেলে কঠিন হাতের অনুশাসন। পা চালাতে অবশ পা। ভেজা শরীরে চোরামুগ্ধ দৃষ্টির টের পাওয়া। সেই ঘাম-বৃষ্টির ঘ্রাণ, সেই একটুকু ছোঁয়া, সেই দপদপে উন্মাতাল শরীরের আকুতি মেহরিন একা হলেই ঘুমে না জাগরণে তাকে অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরতো তা সে বলতে পারেনা। কিন্তু সাহেদের অনাবিল আদর, নিখাঁদ মমতায় মেহরিন কোনদিন সেই ঘ্রাণ সেই কাপুঁনিকে আশেপাশেও খুঁজে পায়নি। আবার 'কী

পাইনি'র উত্তরও ওর জানা নেই। শুধু পানসি ভালো হয়ে উঠলে আর কিছুই দরকার হতো না। ডেকে ডেকে স্মৃতিকাতরতার কোন মানেই হয় না। সাহেদ তো কোন কিছুই ওর অপূর্ণ রাখেনি। কিন্তু সাহেদ কেন এত বেশি ভালো। সাহেদ কেন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে পানসিকে ঘুম পাড়ানোর পর? কেন একটু বেহিসেবি রাত জাগেনি? কেন অনেক রাতে ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেহরিনের সুদূরিকা চোখে পড়ে দেখেনি কবিতার অন্ত্যমিল? সাহেদের ধাঁচটাই কি ওরকম না মেয়ের অসুস্থতা ওকে ক্রমেই হিসেবি করে তুলেছিল? নাকি বেশি পেয়ে পেয়ে মেহরিনের না-পাওয়ার জন্যই ছিল বিলাসী অভাব?

আজ সব দায় দায়িত্ব মেহরিনের। ওর কিছুর প্রয়োজন নেই। কোন বেহিসেবি রাতের স্বপ্ন ও দেখতে চাই না। কেবল সাহেদ ফিরে আসুক। পানসিকে বুকে জড়িয়ে মেহরিনকে খানিক স্বস্তি এনে দিক। একা এ ভার সে কেমন করে বইবে?

সাহেদের সহকর্মী অকৃতদার আজাদ রশিদ আগেও মেহরিনদের বাসায় এসেছে। তবে সব লোকনিন্দা উপেক্ষা করে সেসময় আজাদ যদি পাশে এসে না দাঁড়াতো মেহরিনের একার পক্ষে অসুস্থ পানসিকে বাঁচিয়ে রাখাই কঠিন হতো। প্রবাসে থাকা মা আর ভাই এসে যে কদিন ছিল সে কদিন কেবল পানসিকে বুকে জড়িয়ে রেখেছিল মেহরিন। বাবার শূন্যতা মেয়েকে এক মুহূর্তের জন্যও অনুভব করতে না দেয়ার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু অতি সংবেদনশীল মেয়েকে বাবার শার্ট নাকে চেপে ধরে কাঁদতে দেখেছে মেহরিন। বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য মা ভাই পীড়াপীড়ি করলেও মেহরিন দেশ ছেড়ে কোথাও থাকার কথা ভাবতে পারে না। পরে যদি কখনও মনে হয় তাহলে ভেবে দেখবে সে।

সাহেদের অফিসের পাওনা, ব্যাংক, বিমা, শেয়ার বাজার সবকিছুর হিসেব বুঝিয়ে আজাদ সেদিন সন্ধ্যার পর ঝুল বারান্দায় চায়ের কাপ হাতে দাঁড়ালে লোড শেডিং। মোটামুটি গুছিয়ে দিয়েছে আজাদ সাহেদের টাকা-পয়সার ব্যাপারগুলো। কিন্তু মেহরিন কতটা বুঝেছে সে সম্বন্ধে আজাদ সন্দিহান। পানসি ঘুমুচ্ছে। আকাশের চাঁদও খানিকটা ঝুলে এলো। আজাদ চাঁদের দিকে চেয়ে বললো–

'আচ্ছা কখন আপনার মনে হয় চাঁদ হাঁটছে আর মেঘ স্থির। আর কখন মেঘ দৌড়ায় আর চাঁদ দাঁড়িয়ে থাকে?'

'যখন পানসি ভালো থাকে তখন চাঁদ হাঁটে মেঘ স্থির। কিন্তু পানসি এখন ভালো নেই তবুও চাঁদ কেন হাঁটছে বুঝতে পারছিনা। আপনার?'

'আমার ঠিক উল্টোটা। চাঁদ হাঁটলে আমার অস্থির লাগে। আর চলিষ্ণু মেঘের সাথে আমি অলস হাঁটি। গন্তব্য নেই। হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে তেপান্তরের মাঠে গিয়ে দাঁড়াই। সেই মাঠটা কিন্তু আমাদের গ্রামের নান্দীরচর। আসলে ছেলেবেলা আমাকে খুব টানে। মেঘ আমাকে ওখানেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়'।

'আর আমাকে টেনে নেয় ঝুম্ বৃষ্টি। পিছল পথ। ভেজা চুল। বৃষ্টি বাতাস আর কিসের যেন কাঁপনলাগা দুপুর'।

তারপর নিরবতা। সন্ধ্যার কোমল আলো মেহরিনের স্নিগ্ধ চিবুক বেয়ে গলায় ঘাড়ে ছড়িয়ে পড়ে। কনে দেখা আলো। বধু কোন আলো লাগলো চোখে। বাতাসে মেহরিনের নরম আঁচল হাত হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা আজাদের পিঠে গিয়ে পড়ে। মেহরিনের নির্ভরতা ওর কাছে আঁচলের চেয়ে কোন অংশে ভারি নয়। কিন্তু মেহরিন কি সে ভারটুকুও ওকে নিতে দেবে না? চা শেষে নিজের কাপ একহাতে আর একহাতে আজাদের খালি কাপ চেয়ে নিয়ে ফিরে আসতে গেলে আঁচল পেয়ে যায় স্বাধীনতা। ঘাড় থেকে খসে পড়ে হাতের ওপর। ব্লাউজের নিচু গলায় উন্মুক্ত হয় নিটোল শিল্প। অস্বস্তির কয়েক মুহূর্ত। আজাদ পরম মমতায় আঁচল তুলে নিয়ে মেহরিনের পিঠে ছড়িয়ে দেয়। খোলা পিঠে আজাদের হাতের ছোঁয়া। মেহরিনের রেশম ত্বকে ঝিরিঝিরি বাঁশপাতার কাঁপন।

আজাদ বলে–

'তাহলে কাল থেকে আমার ছুটি'

'বারে, আমি একা একা সব সামলাবো কী করে?' বলে নিজেকে সামলাতে মেহরিন দ্রুত ঘরের ভেতর চলে যায়। পানসি জেগে উঠেছে।

সাহেদের অন্য সহকর্মী বন্ধুরা বলাবলি শুরু করেছে–

'ভালোই তো। আজাদও একা। উনিও। হলে খারাপ কি?'

'তা বলে বছর না ঘুরতেই?'

'একে সুন্দরী তার ওপর অসুস্থ মেয়ে'

'একা থাকাটাও নিরাপদ না'

'যাদের ভালো তাদের বুঝতে দে রে ভাই'।

অ-সংসারী মেহরিন মেয়ে বুকে নিয়ে কোন কূল-কিনারা পায় না। আজাদও যখন তখন আসার ছুঁতো খুঁজে পায় না। মেহরিন মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে–

'আজাদ কাকু কেমনরে পানসি?'

'ভালো'

'বাবাই-এর মতো?'

'না'

'তাহলে?'

'কাকুর মতো'

'ও যদি আমাদের সাথে থাকে কেমন হয়?'

'কোন ঘরে?'

মেহরিন মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোন জবাবে মেয়েটি খুশি হবে?

'এই বাসাতেই'

'থাক না'।

মানে কী? মেয়ে কি চাচ্ছে না, না কি রাজি? আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে মেহরিনের ভারি লজ্জা লাগছিল। কলিং বেল। মেহরিন জানে এ বেল আজাদের। ছুটে গিয়ে দরজা খুলতে হচ্ছে করে। কিন্তু পানসি কী ভাববে? মেয়েকে কোলে নিয়ে বসেই থাকে। পানসিই বলে–

'আজাদ কাকু বোধহয়। যাও মা খুলে দাও'।

মেহরিন অস্থির হয়। কিন্তু অনিচ্ছা দেখিয়ে দরজা খোলে। আজাদের হাতে চকোলেটের বাক্স, টেডি বিয়ার আর পানসির একগাদা টেস্ট-রিপোর্ট। পানসির অসুস্থ চোখে ঝলমলে আনন্দ। মেহরিন যেন ওর সম্মতি পড়ে ফেলে।

তবে পানসি হ্যাঁ না কিছুই বলে না। ও যেন একেকদিন একেকরম। অসুস্থতার দিনগুলোতে আজাদ ওর বিছানায় গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে পানসি নিজের হাত দিয়ে আজাদের হাত ধরে রাখে। মেহরিন নির্ভার হয়। মনে হয় এইবেলা কথাটা পেড়েই ফেলা যাক। ওমা! মেহরিন একটু সাহস পেয়ে আজাদের পাশাপাশি দাঁড়াতেই পানসি আজাদের হাত ছেড়ে দিয়ে কপালে বিরক্তির ভাঁজ ফেলে। আবার কোনদিন যখন দুপুরে পানসিকে পাশে নিয়ে চোখের ওপর হাত রেখে শুয়ে থাকা মেহরিনের চোখের পানি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে তখন পানসি বলে–

'মা, ও মা, খারাপ লাগে?'

'হ্যাঁ মা'

'বাবাই মরে গেছে তাই?–মেয়ে যেন নিশ্চিত হতে চায় মা আসলে কেন কাঁদছে।

মেহরিন ফোঁপাতে থাকে। সাহেদের চলে যাওয়া, ওর অনভিজ্ঞ সংসার জীবন, অসুস্থ মেয়ে নিয়ে অসহায়তা, আজাদকে সরিয়ে রাখা–একসাথে এতোগুলোর ব্যাখ্যা সে ঐটুকুন পানসিকে কীভাবে দেবে?

মেয়ে খানিক চুপ করে থেকে কী যেন বুঝে নিয়ে বলে–

'আজাদ কাকুটা যেন কী! রাতে আমাদের বাসায় থাকলেই তো পারে'।

মেহরিন কাত হয়ে মেয়েকে বুক জড়িয়ে ধরে। মেয়ে মায়ের চোখ মুছিয়ে দেয়। মায়ের ঠোঁটের কোণে বাঁকা চাঁদ । পানসির মুখ পানসে।

সেই রাতে প্রথার ব্যবধান দূর হলে আকাশে চাঁদ। মেঘের ঘষা লেগে চাঁদটা যেন ধেবড়ে যাওয়া সিঁদুরের টিপ। চাঁদ ছোটে না মেঘ দৌড়ায়? কেউ কি দেখছে তা? ওরা দুজনেই তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। মেহরিন আর আজাদ। পাশাপাশি। এতো কাছে তবুও ছুটে চলা চাঁদের গন্তব্য নেই। মেঘ যেন এইবার পথ আটকালো। ঘন আঁধারে সমুদ্র আছড়ে পড়লো বালিয়াড়িতে। মেহরিনের কানে যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসা আজাদের শঙ্খহৃদয়। কী তুমুল গর্জন! মেহরিন আঁকড়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়তে চায়। আজাদের অনেক তৃষ্ণার চাতক ঠোঁট ঝুঁকে প'ড়ে ঠোঁটের পানি শুষে নিতে চায়। কিন্তু তারও আগে মেঘ সরে যায়।

'মা, আমাকে নিয়ে শোবে চলো'–চাঁদের ঝকমকে আলোয় পেছনে দাঁড়ানো মুখ নিচু করা পানসির দৃঢ় আদেশ। ছিটকে সরে যায় মেহরিন। আজাদ হাত বাড়িয়ে পানসিকে কোলে তুলে নিতে গেলে সে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। মা মেয়েকে বুকে তুলে নিয়ে মেয়ের বিছানায় চলে যায়।

পানসি মায়ের নতুন শাড়ির আঁচল আঙুলে পেঁচিয়ে চোখ বন্ধ করে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। মেয়ের গায়ের ওপর হাত বিছিয়ে দিতেও সংকোচে মরে মেহরিন। ছি! ছি! আগে

তার অসুস্থ মেয়েটি না তার নতুন জীবন? তখনও ওর বুকের ভেতর কড়া নাড়ার শব্দ। চোরা চোখে দরজার দিকে তাকায়। না, কারো ছায়া নেই। হাত চলে যায় মেয়ের মাথায়। অবচেতন মনে ওকে ঘুম পাড়ানোর প্রচেষ্টা। যদিও মনে মনে বলে মেয়েকে ছেড়ে ও কোথাও যাবে না কিন্তু গলায় ঘুম পাড়ানি গানের কলি। ও নিজে কতরাত ঘুমায়নি কিন্তু ওর চোখ জেগে আছে আরও রাত জাগার প্রত্যাশায়। কোন একসময় ওর নিজের মাথায় কার মমতার স্পর্শ। শব্দহীন নিঃশ্বাস নিয়ে অপেক্ষার মানুষটির নিরব আহবান। মেহরিন সন্তর্পনে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে আহবানে সাড়া দিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। নিচে পা ফেলতেই মেয়ের আঙুলে জড়ানো শাড়িতে টান লাগে। পানসি উঠে বসে। আজাদ নিজেকে সরিয়ে নেয় আড়ালে। তখন সকালের রোদ সব আড়াল ভেদ করে জানালা দিয়ে ঢুকে মেঝের ওপর আলসেমিতে গা গড়িয়ে নিচ্ছে।

দিন কেটে যায়। পানসির অভিমানকে ওরা দুজন কেউ ছোট করে দেখে না। ওরা বুঝে নেয় কোথায় পানসির অস্থিরতা। একা আজদের সাথে পানসি সহজ। কথা বলে। গান গায়। ছবি আঁকে। কিন্তু আজাদ আর মেহরিনকে একসাথে একটু হেসে কথা বলতে দেখলেই পানসি অসুস্থ হয়ে পড়ে। মেয়ের চোখের রঙ কখন নিষ্প্রভ হয় , কখন চোখের কোল বসে যায় মেহরিন সে সূচিপত্রের সতর্ক পাঠক। অসুস্থ মেয়েটি যদি আরও অসুস্থ হয়ে যায়? কিছুদিন গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে মনে করে ওরা অধরা মাধুরী নিয়ে একই ছাদের নিচে তৃষ্ণার্ত রাত্রিদিন যাপন করতে থাকে। সাহেদের জন্য এমন টান তো মেহরিন বিয়ের পরপরও কোনদিন অনুভব করেনি। দূরে দাঁড়িয়েও আজাদের শরীরের ঘ্রাণ ওকে এমন উন্মাতাল করে তোলে কেন? কবে ওর বুকের মধ্যে ও নিজকে সমর্পন করতে পারবে? নিবেদনের কান্না কি আজাদ বোঝে? কেন বুঝবে না? আজাদের একটুকু ছোঁয়াতেই ওর সারা শরীর তাহলে কেন নিভৃত সময় দাবী করে? সাহেদের সাথে সাত বছরের বিবাহিত জীবনে শরীরের চাহিদা যে মেটেনি তা তো নয়। তাহলে আজাদের জন্য শরীরে এমন কুমারীর চাওয়া কেন? মেয়ের ক্ষোভ ঈর্ষাকে মূল্য দিতে গিয়ে মানুষটাকে আর কতো কষ্ট দেবে? আজাদ জানে দুপুরে পানসিকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় ওর মা। একদিন আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে আজাদ দুপুরে বাসায় আসে মেহরিনের সাথে টেলিফোনে কথা বলে। বেড়াল পায়ে খুব সন্তর্পনে দরজা খুলতেই পায়ের নিচে জলতরঙ্গ। জলে ঝাঁপ দেবার মুহূর্তেই পেছন থেকে 'মা' ডাক।

অনেক দ্বিধা নিয়ে এক দুপুরে মেয়ের সাথে কথা বলে–

'পানসি আমার পানসি তরী, আজাদ কাকুকে কি তুই বাবাই বলে ডাকবি?'

'কী দরকার? কাকুতেই তো বেশ চলে যাচ্ছে'– সাড়ে আট বছরের মেয়ের কী স্পষ্ট উত্তর।

'না মানে বললে ও খুশি হয়'

'কার খুশি চাও মা? আমার না ওর?'

'তোর তোর তোর'।

মেহরিনের গলায় কি অধৈর্যের সুর? পানসি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মা কি রাগ করে বললো না সত্যি করেই? ব্যাকুল হয়ে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে মেহরিন কাঁদে। অনেকক্ষণ কাঁদার পর নরম গলায় বলে–

'আমার কাছে তোর বড় কেউ নয় পানসি। কিন্তু ও তো তোকে বাবার মতোই ভালোবাসে'। মেয়ে কী বুঝে বললো–

'ঠিক আছে'।

এই ঠিক আছে-এর সম্মতিতে মেহরিন স্বস্তি-অস্বস্তির দোলায় দুলতে লাগলো। এ কি তার মেয়ের আরও বেশি অভিমানের কথা? তা না হলে রোজ রাতে আজাদ এলে টেবিলে খাবার দেবার সময় পানসি গিয়ে চেয়ারে বসে থাকে। মেহরিন যতক্ষণ ডাইনিং-এ থাকে পানসিও ততক্ষণ। মায়ের কাজ শেষ হলে মায়ের হাত ধরে বিছানায় নিয়ে আসে। সেদিন 'ঠিক আছে' বলার পর পানসি কেন খাবার টেবিলে গিয়ে বসলো না? কেন চোখের নজরদারিতে মাকে বন্দি রাখলো না? কেন খাওয়া শেষ হওয়ার পরেও মাকে বিছানায় আসতে বললো না? তার একফোটা অসুস্থ মেয়েকে কষ্ট দিয়ে মেহরিন কেবল শরীরের ক্ষুধা মেটাতে আজাদের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়বে? এ কোনদিন হয়? আজাদ মুখে কিছু না বললেও পানসির আচরণে পরিবর্তন হয়েছে দেখে মেহরিনকে রাতে পাশে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কিন্তু মেহরিন পারে না। আজাদকে একটু ছোঁয়াও না দিয়ে পানসির পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে একটা হাত মেয়ের পেটের ওপর বিছিয়ে দিয়ে বুঝাতে চায় সে এসে গেছে। কিন্তু যে মেয়েকে এ দু'মাসে রাতে যখনই চোখ খুলেছে তখনই চোখ মেলা অবস্থায় দেখতে পেয়েছে সেই তাকে এই প্রথম ঘুমুতে দেখলো। ইচ্ছে হলো ঘুমন্ত মেয়েকে জাগিয়ে দেখায় যে ও রোজকার মতো ওর বিছানাতেই চলে এসেছে। মেয়ের মাথায় একটু জোরেই আঙুল বুলালো যাতে চোখ মেলে মাকে একবার দেখে। যে অসুস্থ মেয়ে সারারাত জেগে মাকে পাহারা দেয় সে মেয়ে ঘুমালেও তাকে রেখে মেহরিন আজাদের কাছে যেতে পারবে না।

লম্বা ছায়া মেহরিনের বুকের ওপর। আজাদ হাত বাড়িয়ে চুপিসারে দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাত থিরথির করে কাঁপছে। যেন শীতের পাতার বসন্তকে আহবান।

'এসো'

'না, থাক'

'পানসি ঘুমায়'

'তবুও'

'কেন?'

'ও যদি জেগে ওঠে'

'আচ্ছা, তাহলে যাই'

'না, এখানে দাঁড়িয়ে থাকো'

এ কথাগুলো ওরা কেবল চোখের ইশারায় বলে। তারপর সারারাত একে অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দেয়।

পরদিন সকালে মেয়ের ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত মেহরিন ওকে ছেড়ে ওঠে না। আজাদ নিজের ঘরের বিছানায় রাতজাগা চোখের ওপর হাত বিছিয়ে শুয়ে। মেয়ে বিছানায় উঠে বসে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। মা দেখে মেয়ের দুচোখ জবা ফুলের মতো লাল। ঠোঁট ফ্যাকাশে। মুখের চামড়া নিষ্প্রাণ। বুকে জড়িয়ে ধরার সাথে সাথে মেয়ে নেতিয়ে

পড়ে মায়ের কোলে। মেহরিন চিৎকার করে ওঠে। আজাদ ছুটে এসে খানিক হতবাক হয়ে চেয়ে থেকে পানসিকে কোলে উঠিয়ে নিয়ে হাসপাতালে দৌড়ায়। আজাদের সাথে মেহরিনের বিয়ের পর এই প্রথম পানসি বেশি অসুস্থ। ওর বাবা মারা যাওয়ার পরপরই ঠিক এরকম একবার হয়েছিল। সেদিনও আজাদ ছিল মেহরিনের পাশে। আজ আজাদের পাশে মেহরিন। প্রায়োচেতন পানসির নাকে অক্সিজেন নল। রক্তের ব্যাগ থেকে পড়া ফোটা ফোটা রক্ত ঢুকে কখন তার পাণ্ডুর মেয়ে স্বাভাবিক রং ফিরে পাবে, কখন 'মা' বলে ডাকবে, মেহরিন পলকহীন চোখে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আজাদ অসুধ, ডাক্তার, রক্ত, টেস্ট-এর জন্য ছুটোছুটি করে। বারবার ফিরে এসে ভেঙে পড়া মেহরিনের পাশে দাঁড়ায়। মেহরিন একটু স্পর্শের জন্য ভেতরে ভেতরে আরো ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। আজাদ কি ওর পিঠের ওপর একটু হাত রাখবে? এলোমেলো চুলগুলো কপাল থেকে তুলে দেবে? মমতার আঙুল দিয়ে চোখের পানি মুছে দেবে? কিন্তু সাবধানী আজাদ ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলে। কী জানি পানসি কখন চোখ মেলে চায়। ওর সুস্থতার জন্য এ রসনাটুকু সম্বরণ করা কি এমন কঠিন! নাকি গতরাতে মেহরিন ওর ডাকে সাড়া দেয়নি বলে ওর অবেচতনে অভিমান?

দুটো দিন চলে যায়। পানসির শরীরের রং ফেরে না। তৃতীয় দিন ডাক্তার নার্স হঠাৎ ব্যস্ত। রক্ত বের করে নতুন রক্ত প্রবেশ করাতে হবে পানসির শরীরে। আজাদ অফিসে হাজিরা দিয়েই ফিরবে বলেছে। অপারেশন থিয়েটারের ভেতর পানসি। অসহায় বিপন্ন মেহরিন দশতলার বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে আজাদের অপেক্ষায় চেয়ে থেকে আবার অস্থির পদচারণায় সময় পার করতে চাচ্ছে। সময় এগুচ্ছে না বরং মনে হচ্ছে ও কোন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে, একটার পর একটা ট্রেন ওর সামনে থেকে ছেড়ে যাচ্ছে। এতক্ষণের ত্রস্ত পায়ের নার্স কেমন শ্লথ ভঙ্গিমায় দরজা ঠেলে ওকে ইশারায় ভেতরে আসতে বলে। মাত্র দশ কদম দূরের দরজা। অথচ মেহরিনের মনে হয় ও পৌঁছাতে পারছে না। ওর পা জগিং মেশিনের ওপর। শুধু চলছে। গন্তব্য নেই। ডাক্তার নার্স বেডটি ঘিরে দাঁড়িয়ে। কারা যেন ওকে জায়গা করে দিল বিনয়ের সাথে। ওর মনিটরে সমান্তরাল রেখাগুলোর দিকে চোখ চলে যায়। ওর তখন মনে হয় ঐ চলমান রেখাগুলো যেন রেললাইন। ও দাঁড়িয়ে আছে তার ওপর। খুব দুলছে। কে যেন পাশ থেকে বলছে 'নিজেকে সামলাতে হবে তো'।

অনেক পরিচিত সুদূরময় ঘ্রাণ মেহরিনকে সামলে নেয়। একটা দেয়াল যেন ইটসুরকির হাত বের করে ওকে ধরে ফেলে। মেহরিন হাউমাউ করে কেঁদে উঠে এই প্রথম নিজেকে আজাদের বুকের মধ্যে আবিষ্কার করে। ডাক্তার তখন পানসির খুলে থাকা প্রাণহীন চোখ হাতের কোমল পাতা দিয়ে বুজিয়ে দিচ্ছিলেন।

বিপ্লুত বেহাগ

(কিশোর গল্প)

টুপুর ছোটবেলায় দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ভয়ে কবুতরের বাচ্চার মতো থরথর করে কাঁপতো। আরো পরে নিজের মুখে হাত চেপে কান্না আটকিয়ে পেসাব করে দিত। রাতেও বিছানা ভেজাতো। ওর নানী ওকে দরজার পাশ থেকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে গিয়ে বুকে চেপে বসে থাকতো যতক্ষণ না ওর বাবা-মায়ের মধ্যে কড়া ঝগড়া ক্রমশ বেলা পড়ে আসা রোদের মতো নরম হয়ে যেত। টুপুরের সব প্রশ্নের জবাব দিতে হতো ওর নানীকে।

'বাবা কেন মার দিকে প্লেট ছুঁড়ে মারলো?'

'বাবা একটু বেশী রাগী তো তাই'

'তাহলে মা কেন তার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল না?'

'মারও তো রাগ হতে পারে'

'টুসকির বাবা মার রাগ নেই কেন?'

'ওরা ভালো'

'আমার বাবা মা ভালো না কেন?'

'ঘুমাও সোনা'।

'একটু ঘুমাতে চেষ্টা করুন' –বলে নার্স টুপুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। টুপুর তো আসলে ঘুমাতেই চায়। সেই ছোটবেলা থেকেই ঘুমাতে চায়। সেই জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এ সতেরটা বছর ঘুমাতে চেয়েছে। কিন্তু ও যখনই ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করেছে তার পরপরই বাবা-মার চিৎকারে জেগে উঠেছে। চোখ খোলেনি। চোখ টিপে বন্ধ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছে 'হে আল্লাহ, ঝগড়া বন্ধ হোক, হে আল্লাহ ঝগড়া বন্ধ হোক।' এমনভাবে বুক ঢিবঢিব করতো যে ওর ভয় হতো বুকের শব্দ না ওর বাবা-মায়ের কানে গিয়ে পৌঁছায়। মা চেঁচিয়ে বলতো–

'গলার স্বর নামিয়ে কথা বল। বাচ্চাটা ঘুমাচ্ছে'

'ও, তুমি বুঝি ভারি ফিসফিস করে কথা বলছ?'

'তোমার মতো গাড়লের কানে ফিসফিসানি পৌঁছায়?'

'এই ভদ্রভাবে কথা বলো'

'ভদ্রলোক হলে ভদ্রভাবে বলতাম। তুমি একটা ইতর। বাচ্চাটা না থাকলে তোমার মুখে নুড়ো জ্বেলে আমি চলে যেতাম'

'আমার বাচ্চা আমার কাছে রেখে তোমার যে চুলোয় খুশি সে চুলোয় চলে যাও'

'ওরে আমার কে রে! ওনার বাচ্চা! তোল ওকে, ও কার কাছে থাকতে চায় ফয়সালা হয়ে যাক'

টুপুর আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছে। টুপুর লক্ষ করতো ও কেঁদে উঠলেই বাবা-মার ঝগড়া আস্তে আস্তে থেমে যেত। মা ওকে বুকে জড়িয়ে নিজেও অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতো আর বলতো–

'মেয়েটাকে আমার সুস্থ হয়ে বেড়ে উঠতে দেবে না। এ অসুস্থ পরিবেশে আমি আর থাকতে পারি না।'

টুপুরের মা বাবা ঝগড়ার সময় কী সব কঠিন কঠিন কথা বলতো ও ছোট বেলায় ওতোসব বুঝতো না। টুপুর জিজ্ঞাসা করতো–

'মা, পুরুষমন্ত্র কী?'

'পুরুষমন্ত্র না, পুরুষতন্ত্র'

'ও, পুরুষতন্ত্র কি খারাপ?'

'খুব খারাপ। দেখনা, তোমার বাবা চায় না আমি চাকরি করি'

'তুমি চাকরি ছেড়ে দিলে তো আর পুরুষতন্ত্র থাকবে না'

টুপুরের মা টুপুরের প্রশ্নের উত্তর হিসেবে নয় যেন আপন মনেই বলেছিল–

'যারা পুরুষতন্ত্র লালন করে তাদের চরিত্রই শোষকের। চাকরি ছাড়লেও ঠিক অন্য একটা ছিদ্র খুঁজে নেবে'। টুপুর তখন এর অর্থ বোঝেনি। কিন্তু ওর মনে হয়েছিল বাবার পুরুষতন্ত্র মেনে নিয়ে মা চাকরি ছেড়ে দিক। ও যে ভয় পায়, ওর একা অসহায় লাগে, ওর মরে যেতে ইচ্ছে হয়, ওর পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়–এসবের চাইতে কি পুরুষতন্ত্র বড়? বাবা মা কি ওর আনন্দ দেখতে চায় না? একদিন নানী দেখে বাবা মা অফিসে বেরিয়ে গেলে টুপুর ড্রইং রুমের সোফার উপর ধিনধিন করে নাচছে। আনন্দে কুশন ছুঁড়ে ফেলছে, কার্পেটের ওপর গড়িয়ে পড়ছে। নানী হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলো। মেয়েটা পাগল হয়ে গেল নাকি? ছোটবেলা থেকেই নানীর কাছেই মানুষ। এ চার বছরে কই এমন করে আনন্দ প্রকাশ করতে দেখেনি তো নানী।

'কী হয়েছে নানুভাই। এত আনন্দ কিসের'?

'আমার মা ভালো বাবাও ভালো'

'কী করেছে তারা?'

'টিভি দেখতে দেখতে বাবা মা একসাথে হাসছিল'

'সত্যি'

'হ্যাঁ, আর মা বাবার ঘাড়ে মাথা দিয়ে টিভি দেখছিল'

নানীর চোখে পানি এসে যায়। নানী ওকে যতক্ষণ ইচ্ছা নাচতে দিয়ে ওখান থেকে সরে যায়। টুপুর নাচতে নাচতে একসময় ক্লান্ত হয়ে সোফার উপর ঘুমিয়ে পড়ে।

নার্স মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। চাচ্ছে টুপুর টানা ঘুম দিয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠুক। টুপুর তো চিরতরে ঘুমাবার জন্যেই চেষ্টা করেছিল। ও ঠোঁট না খুলেও মুখের মধ্যে জিব নেড়ে জীবনানন্দ পড়ে–

'আমি যদি হতাম...

নানীওতো মাকে নিষেধ করতো ঝগড়া ফ্যাসাদে না যেতে। নানী প্রায়ই বলতো–

'মেয়েমানুষদের একটু সহ্য করতে হয়, অনেককিছু মেনে নিতে হয়'

'বাহ্, আমি সংসারে কন্ট্রিবিউট করি না? আমি সারাদিন অফিস করি না?'

'তারপরেও মেয়েমানুষ তো'

'তাহলে এস এস সির পরেই বিয়ে দিয়ে দিলে পারতে। এম এ পাস করানোর সময় মনে ছিল না?'

'জামাই যদি সংসার চালাতে পারে তাহলে এতো হাঙ্গামা করে চাকরি করার দরকার কী?'

'মা, চাকরি করি যতটা না সংসারের সচ্ছলতার জন্যে তারও চেয়ে বেশি নিজের একটা পরিচয়ের জন্যে'।

টুপুরের মা এরকমই। নানীও মাঝে মাঝে মেলাতে পারেন না। তাইতো, টুপুর অসুস্থ হলে টুপুরের মাকে ছুটি নিতে হয়। টুপুরের স্কুলে ভর্তি, স্কুলে সকালে পৌঁছে দিয়ে অফিস যেতে হয় টুপুরের মাকেই। নানীকে মেয়ে দেখার জন্যে গ্রামের শেকড় থেকে উপড়ে ঢাকা শহরে রেখে দিয়েছে চার দেয়ালে বন্দী করে। আবার যদি টুপুরের দাদার অসুস্থতায় টুপুরের মাকেই ছুটি নিয়ে গ্রামে গিয়ে ক'দিন সেবা করে আসার হুকুম দেয় টুপুরের বাবা সেটাও তো একটু বেশী চাওয়া হয়ে যায়। শুধু নিজের মেয়ে বলেই না, ঘরে বাইরে উদয়াস্ত পরিশ্রম করা একটা মেয়ে সবকিছু হাসিমুখে মেনে নেবে–নানীর কাছে তাও গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। কিন্তু টুপুরের বাবা নানীকে খুবই সম্মান করেন। নানীর সুবিধা অসুবিধা টুপুরের মায়ের চেয়ে বেশী খেয়াল করেন তিনি। আবার নালিশও জানান–

'আম্মা দেখলেন, আপনার মেয়ের আচরণ? আমি নিষেধ করলাম টুপুরকে নাচের স্কুলে না দিতে, ও তা না শুনে ভর্তি করে দিল। আমি চাচ্ছিলাম আমার মেয়ে গান শিখবে'–বলে টুপুরকে কোলে নিয়ে মেয়ের সম্মতি পেতে চান

'আমার সোনা মা, তুমি গান শিখবে না নাচ? বলতো মা?'

টুপুর একবার মায়ের চোখের দিকে, একবার বাবার মুখের দিকে, একবার নানীর দিকে তাকিয়ে মিনমিন করে ছোট্ট কুটনীতিকের মতো উত্তর দেয়–

'আমি গানও শিখবো, নাচও শিখবো। না হলে কোনটাই শিখবো না।'

এভাবে মা ও বাবার মধ্যেকার দা-কুমড়ো সম্পর্কটাকে টুপুর তার ছোট্ট মনন দিয়ে সেই ছ'সাত বছর বয়স থেকেই স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করতো–তা কি তার শিক্ষিত মা-বাবার তখন মাথায় ঢোকেনি? বাবা-মার সম্পর্কের ঐ টানাপোড়েন একটা ছোট্ট বুক ভেঙেচুরে তচনচ করে দিত–তা কেন তারা বোঝেনি?

তারপর যখন টুপুর ক্লাস এইটে তখন ওর রেজাল্ট কার্ড নিয়ে বাবা মা যা শুরু করেছিল তাতে ও যে আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল তাতো ওদের বুঝিয়ে বলতে পারেনি সে। শেষপর্যন্ত ওদের ক্লাস টিচার গার্জেনকে ডাকতে বাধ্য হয়েছিল। টুপুরের বাবা গিয়েছিল। ক্লাসটিচার বলেছিল টুপুর ক্লাসে কারো সাথে কথা বলে না, খেলে না, প্রশ্ন করলে হ্যাঁ বা না সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়। সবচে বড় কথা সে মোটেই পড়াশুনায় মনোযোগী নয়। ক্লাস ফলো না করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। ক্লাসটিচার ফ্যামিলিতে কোন সমস্যা আছে কিনা জানতে চান। বাবা রেগে মেগে কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে

বাসায় এসে মার সাথে তুমুল হট্টগোল বাধিয়ে দেয়।

'আমি আগেই বলেছিলাম এ স্কুলে আমি মেয়েকে দেব না। টিচাররা কেয়ার নেয় না আবার আমাকে উল্টে জিজ্ঞাসা করে ফ্যামিলিতে কোন প্রবলেম আছে কিনা। সব দোষ তোমার'

'আমাদের বংশে কেউ কোনদিন ক্লাসে সেকেন্ড হয়নি। টুপুর তোমার ব্রেন পেয়েছে। সব গাধার বাচ্চা!'

নার্স মাথায় হাত বুলানোর জন্যেই কি না টুপুরের একটু ঝিমুনি এসেছিল। কিন্তু ওর যে ঘুমাতে ভয় করে। ওর মনে হয় ঘুমালেই মা বাবার কথাকাটাকাটিতে ওর ঘুম ভেঙে যাবে। সেই রাতের পরই তো মা আলাদা হয়ে অন্য বাসায় চলে গিয়েছিল। মা সাতদিনের জন্যে ঢাকার বাইরে টুরে যাবে বলে সন্ধ্যে থেকে ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে রেখেছিল। পাশের ঘরে নানীর কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে গেলে রাতে মা বাবার ঝগড়ায় ওর ঘুম ভেঙে যায়। দেখে নানী বিছানায় উঠে বসে দুহাঁটুতে মাথা গুজে বসে আছে। পাশের ঘরে বাবার উচ্চস্বরে প্রতিবাদ–

'না তোমার টুরে যাওয়া হবে না'

'তুমি যে দশদিন কাটিয়ে এলে। আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম'?

'আমার সাথে তোমার কিসের তুলনা? চাকরি করছো সেটাই অনেক বড়। টুপুরের এখন বয়ঃসন্ধিকাল। ওকে ছেড়ে তোমার কোথাও থাকা হবে না। আর মেয়েমানুষের টুরফুর করা আমার একদম পছন্দ না'

'এই মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ করবে না বলে দিচ্ছি'

'তো কি তুমি পুরুষমানুষ?'

'আমি মানুষ। ব্যস্। হয় আমি টুরে যাবো নয় এ বাসা ছেড়ে চলে যাবো। দিস ইজ ফাইনাল।'

টুপুরের মা সত্যি সত্যিই মা আর মেয়েকে নিয়ে তার বড় বোনের বাসায় চলে গিয়েছিল। টুপুরের বাবা ব্যাপারটা এতোদুর গড়াবে ভাবেনি। কেবল ওদের বেরিয়ে যাওয়ার মুখে গলার স্বরে অপরাধের ভাঁজ তুলে টুপুরের নানীকে বললো–

'আম্মা, আসলে আপনার মেয়ের আমার সাথে সংসার করার ইচ্ছে নেই'।

টুপুর আহত বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট পায়ে মায়ের পিছু পিছু বেরিয়ে যায়। টুপুরও হয়তো বাবার মতো ভেবেছিল ওর মার রাগ পড়ে গেলেই ফিরে আসবে। বাবার জন্য টুপুরের মায়া হতো। আবার মায়েরও কোন দোষ খুঁজে পেত না। ঠিকইতো বাবা মাসে দশদিন টুর করে আর মা এই প্রথম টুরে যেতে চেয়েছিল বলে বাবা কেন যাচ্ছেতাই বললো? এটাওতো মেনে নেয়া যায় না। বোনের বাসায় দশ-বারো দিন থেকে নিজের অফিসের কোয়ার্টারে উঠে গেল টুপুরের মা। টুপুরের নানী মনের দুঃখে যেতে চাননি। কিন্তু টুপুরকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছেন, ওকে ছেড়ে থাকতে পারবেন কেন? নানী মাকে অনেক বুঝিয়েছে। মায়ের সেই এক জবাব–

'আত্মসম্মান চলে গেলে আর কিছু থাকে না মা।'

'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এতো মান-সম্মান দেখতে গেলে সংসার টেকে? সংসারে থাকতে গেলে কিছু ছাড় দিতেই হবে'

'ছাড় কি সারাজীবন মেয়েরাই দেবে? অতো সোজা না'

'টুপুরের কথা তোমরা কেউ ভাবলে না?'

'বাবার জন্যে পরান পুড়লে চলে যাক ও বাবার কাছে'।

ছোটবেলায় নানীর সাথে টুপুর অনেক কিছু শেয়ার করতো। বিশেষ করে ওর বাবা মার মধ্যেকার সম্পর্কের বিষয়টা। এখন আর কিচ্ছু বলে না। এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে কোচিং-এ ভর্তি হওয়ার পরই মা চলে এলো আলাদা হয়ে। ওর মা অফিস বেরিয়ে গেলে কানে মোবাইল লাগিয়ে কার সাথে যেন অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে। টুপুরের মাকে সেকথা নানী বলেওছিল। টুপুরের মা ভেবেছিল মেয়েটা একা থাকে। দু একটা বন্ধু-বান্ধব হলে বরং ভালো থাকবে। বলুক না একটু কথা। সেকেলে মানুষগুলো নিয়েও ঝামেলা। আধুনিক ভাবধারার সাথে একাত্ম হতে পারে না।

কিন্তু কিছুদিন পর নানী লক্ষ্য করে টুপুর অসময়ে ঘুমায়, নিয়মিত গোসল করে না, খাওয়াতেও রুচি নেই। নানী উপদেশ দিতে গেলে নানীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে। টুপুরের মায়ের মানসিক অবস্থা ভালো না। সারাদিন অফিস করে ক্লান্ত হয়ে আসলে নানী টুপুর সম্পর্কে বেশি কিছু নালিশ করে না। মা বসে টিভি দেখে, মেয়ে কম্পিউটারে গেম খেলে।

টুপুরের মা অফিসে বসেই জেনে নিল মেয়ের এসএসসির রেজাল্ট। ফেল। রাগে দুঃখে দুশ্চিন্তায় বাসায় ছুটে এসে দেখে মেয়ে দিব্যি ঘুমাচ্ছে। টুপুরের চুল ধরে টেনে তুলে মা ক্রোধে ফেটে পড়লো–

'নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে, ফেল করার খবর পেয়েও আরামে ঘুমাচ্ছিস! আমি এখন মানুষকে মুখ দেখাবো কেমন করে? তোর বাবা জানতে পারলে আমার মান-সম্মান থাকবে?'–বলে টুপুরের গালে কষে একটা চড় লাগিয়ে টুপুরের মা নিজেই হাউমাউ করে কাঁদতে বসলো। টুপুর কথা না বলে, চোখের পানি না ফেলে, ঝিম ধরে বসে রইলো। নানী বললো–

'আমি আর তোমাদের সাথে থাকতে পারবো না। আমাকে গ্রামে রেখে আসো। এতো অশান্তি আমি জীবনে দেখিনি বাপু'।

টুপুরের রেজাল্টের একদিন পর টেলিফোনে টুপুরের নানীর কান্নাকাটি আর পাগলের মতো চিৎকার শুনে টুপুরের মা বাসার কাছে এসে পৌঁছাতেই দেখতে পেল টুপুর অচেতন। মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। পাশের বাসার প্রতিবেশী ঘাড়ের ওপর তুলে নিয়ে তাদের গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে।

পাকস্থলী পরিস্কার করিয়ে ডাক্তার সে যাত্রা টুপুরকে বাঁচিয়ে তুললো। টুপুরের মা ক্লিনিকে টানা তিনদিন টুপুরকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখে চারদিনের দিন অফিস গেল। একবারও জিজ্ঞাসা করলো না কেন এ সর্বনাশ করতে গিয়েছিলি, কে তোকে এ পরামর্শ দিলো? আরও দুদিন পর টুপুর ছাড়া পাবে।

নার্স টুপুর ঘুমিয়ে গেছে দেখে আস্তে করে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু টুপুর আদৌ ঘুমাচ্ছে কিনা তা সে নিজেও বুঝতে পারছে না। একবার মনে হলো ওর কোচিং-এর সহমর্মী বন্ধু রেহান ওর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। যেন ওর কানে কানে ফিসফিস করে বলছে–

'টুপুর দেখ, তোমার জন্যে একবোতল ইনট্যাক্ট ফেনসি নিয়ে এসেছি। বোকা মেয়ে, অতোগুলো ঘুমের অসুধ তুমি একসাথে খাবে জানলে আমি তোমাকে দেই? এটা থেকে আবার দু চুমুক খাও, দেখবে কোন কষ্ট নেই, দুঃখ নেই, অভিমান নেই, দুঃশ্চিন্তা নেই। তুমি পাখির মতো উড়ছো, রঙিন মাছের মতো এ্যাকুরিয়ামে সাঁতার কাটছো, ক্রমাগত দুঃখের বাতাস অতিক্রম করে আকাশের অনেক ওপরে চির বসন্তের বায়ুমণ্ডলে ভাসছো।'

বলে রেহানও যেন কেমন ওর চারপাশে কয়েক চক্কর দিয়ে ভেসে ভেসে চলে গেল ওর সামনে থেকে। রেহান চলে গেলে ও দেখলো ওর বাবা ছুটে আসছে। হাতে অসংখ্য বেলুন আর চকোলেটের বাক্স। পাশে বসে টুপুরের কপালে গভীরভাবে চুমো খেল। ও কপালে উষ্ণ দুফোটা পানির ছোঁয়া পেল। আরে পেছনে কে? টুপুর ঠোঁট ফাঁক করে উচ্চারণ করলো 'মা'। বাবা উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের ঘাড়ে ঘনিষ্টভাবে হাত দিয়ে টুপুরের দিকে তাকিয়ে হাসছে। দুজনের চোখেই পানি টলটল করছে।

টুপুর ঘুমাচ্ছে না জেগে আছে তা ও নিজেও বুঝতে পারছে না। কিন্তু তার সামনে দাঁড়ানো যুগলবন্দী বাবা-মা যদি বাস্তবের রোদে ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যায় তাই ওর মনে হচ্ছে এটা যদি স্বপ্নও হয় এ স্বপ্নে যেন ও চিরদিন থাকতে পারে। দৃশ্যটা ওর জীবনে দেখা একমাত্র আনন্দের দৃশ্যের সাথে মিলেমিশে কেমন একাকার হয়ে যাচ্ছিল। ও দেখলো–ওর মা হাসতে হাসতে বাবার ঘাড়ে মাথা দিয়ে টিভি দেখছে। আহ্! এতোগুলো বছর কেটে গেছে কিন্তু স্মৃতির এ্যালবামে আটকিয়ে রাখা এ ছবিটা এতোটুকু ম্লান হয়নি।

কবি কবিতা এসএমএস...

shuchorita, a shaptahe kono potrikai tomar kono kobita pelam na. tomar kobita amar beche thakar prerona. Plz amake disappoint koro na. take care. Anondo

এস এম এস-এর সংকেত পেয়েই সুচরিতা বালিশের কাছে রাখা মোবাইলটা হাতে নিয়ে মেসেজ চেক করতে গেল। হাতের কাছে আবার চশমাটা নেই। এতো ছোট লেখা আজকাল খালিচোখে পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। চালশে বোধহয় একেই বলে। ও, আবার সেই আনন্দ। ঠিকই। গত সপ্তাহে কোন কবিতা কোন পত্রিকায় পাঠাতে পারেনি সুচরিতা। মেয়ের 'এ' লেভেল সামনে। একটু আধটু দেখিয়ে না দিলে ফাঁকিবাজ মেয়েটা বইয়ের নিচে মোবাইল রেখে অদ্ভুত কায়দায় সারাক্ষণ এসএমএস করে। ওর পরীক্ষাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুচরিতা কবিতা লেখায় মন দিতে পারছে না। কবিতার ভাবনা এসে কোনোটা মাথায় অনর্গল কড়া নাড়ছে, কোনোটা সমুদ্রের বালুতে রাখা পায়ের ছাপের মতো ঢেউয়ের সাথে মিলিয়ে যাচ্ছে। গতরাতেও দুটো ভাবনা এসেছিল। এখন একটাও মনে পড়ছে না। মারুফ অবশ্য বলে ভাবনা এলেই চট করে থিমটুকু লিখে রাখবে। পরে পত্র-পুষ্প-পল্লবে খাতার পাতা ভরে তুলবে। মাঝে মাঝে এমন চমৎকার ভাবনা এসে মিলিয়ে যায় যে সুচরিতা মনের হার্ডডিস্ক ঘেঁটেও কোন নিশানা পায় না। ইস্ মনের মধ্যে যদি save আইকন থাকতো। তাহলে মাথায় একটা টোকা দিলেই ভাবনাটা আবার ফিরে আসতো। ভালো ভাবনা হারিয়ে গেলে সেদিন সুচরিতার খুব মন খারাপ থাকে। ও কেবল হাতড়াতে থাকে। ভাগ্য ভালো হলে টিভির কোন দৃশ্য বা কোনো লেখা পড়তে গিয়ে বা বাসার কারো কোন কথায় কিংবা বারান্দায় পড়ে থাকা তেরসা রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে ভাবনা ফিরে আসে। তখন সুচরিতার নিজেকে পৃথিবীর সবচে সুখী আর নির্ভার মনে হয়। একেই বোধহয় বলে প্রসববেদনা। অবশ্য সুচরিতা প্রসববেদনা কী তা জানে না। কারণ সুকন্যা সিজারিয়ান বেবি। ও জন্মের সময় সুচরিতা একফোটা ব্যথাও অনুভব করেনি। তাই মারুফ বলে–

'ভাগ্যিস কবিতা লিখতে পারো, তানা হলে প্রসববেদনাতেও যে কতো আনন্দ তা বুঝতে পারতে কী করে?'

'ব্যথা ছাড়া বুঝি আর কোন কষ্ট নেই? এই যে দশমাস পেটে বয়ে বেড়ানো, লালন করা, পোষ্ট অপারেটিভ যন্ত্রণা এ কি কম কষ্ট?'

'তবুও'

'তবুও কী? বেশতো, তুমিও একটা কবিতা প্রসব করে নারীদের বেদনা শেয়ার কর। ও ক্ষমতাটাও তো নেই'

'ও বেদনা তোমার মুখেই লাগাক দোলা। আমার শুধু দেখার চোখটি থাকুক খোলা।'

তবে সব ভাবনাই সফল কবিতা হয়ে ওঠে না। কোন কোনটা আধাখেঁচড়া হয়ে দিনের পর দিন খাতার মধ্যে পড়ে থাকে। কোনটা নিমিষে তরতর করে ডানাকাটা পরী হয়ে ওঠে। কেবল একটু প্রসাধন ছোঁয়ালেই একেবারে ডানা মেলে ঘুরে বেড়ায় ভালোলাগার বোধের দেয়ালে।

কোনকোনদিন স্বপ্নেও সুচরিতা দুএকটা শব্দ পেয়ে যায়। স্বপ্নটা একটুও মনে থাকে না কিন্তু শব্দগুলো পুরোন গানের মতো বারবার সুর তোলে। একদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই ওর মুখ দিয়ে অটোমেটিক বেরিয়ে গেল–স্বখাত সলিল'। তারপর সারাদিন ও এটা ওটা করার মধ্যে বিড়বিড় করে বলতে থাকলো 'স্বখাত সলিল'। ওর মনে আছে ঐদিন মারুফ একবার জিজ্ঞাসা করেছিল–সুকন্যার যে বান্ধবীটা মাঝে মধ্যে আসে তার নামটা যেন কী? সুচরিতা উত্তর দিয়েছিল 'স্বখাত সলিল'। যতক্ষণ না শব্দ দুটোর দরজা খুলে ভেতর থেকে আলীবাবার হিরেজহরত খাতার উপর ছড়াতে পারলো ততক্ষণ ওর হেলুসিনেশন বন্ধ হলো না। তারপর খাতা কলম টেনে ঠিক লিখে ফেললো, কবিতাটার প্রথম আর শেষ দু'স্তবক ওর এখনও মনে আছে–

'একদিন দুদিন করে টানা দুই যুগ
খননের বদ্ধ ঘরে জমা করি ফোটাফোটা জল সুখময়
ইপ্সিত তরলে দেখি আমারই এ মুখ
নার্সিসাস অনুভবে নিশ্চল গ্রীবা জেগে রয়।

শত রূপ সরে যায় দূর চলাচলে
ডানায় স্মৃতির কণা পক্ষ মেলে স্বর্ণাভ চিল
আমি শুধু ছায়া দেখি সঞ্চিত জলে
আমার মুর্খ চোখ টেনে রাখে আমারই সে স্বখাত সলিল।'

সুচরিতার মুগ্ধ পাঠকদের মধ্যে আনন্দের প্রতিক্রিয়া সবচে ভারসাম্যপূর্ণ। আনন্দ অনেক অসামঞ্জস্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কিন্তু খুব শালীন ও কৌশলে। তবে একটা কবিতার সব লাইন বা সব শব্দই যে ভাবনার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে এ কথা মানে না সুচরিতা। একবার একটা কবিতা পড়ে আনন্দ লিখলো–

last duto line na eleo kobitata ekta complete kobita hoye thakto'.
'kintu o duto line to khub khapchara bole amar mone hocche na'.
'kobi, pathoker mononke upekkha korcho?'
'ok baba, thikase'
'rag korle?'
'dur boka.'

সুচরিতার অনুপ্রেরণা তার বাবা, স্বামী আর মেয়ে। ওর কবিতা প্রকাশ পেলে সবার আগে বাবা টেলিফোন করে। সুচরিতা হয়তো তখন ঘুম থেকেই ওঠেনি। সাধারণত

শুক্রবার দৈনিকের সাময়িকীর পাতায় ওর কবিতা ছাপা হয়। কোন কোন সপ্তাহে একটা পত্রিকায় আবার কোন সপ্তাহে দু'তিনটায়ও আসে। ওর বাবা নাকি শুক্রবার ভোরের আলো ফোটার আগে থেকেই বারান্দায় গিয়ে বসে থাকেন। কখন হকার আসে। শুক্রবারে চারপাঁচটা দৈনিক রাখেন। মেয়ের কবিতা পড়ে টেলিফোনে ঘন্টাখানেক ধরে তার প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পারলে বিকেলে এসে তিনিই এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন মেয়ের হাতে। পর পর দুতিন সপ্তাহ বন্ধ্যা গেলে মারুফ মানে সুচরিতার স্বামী বলে–

'কাব্যচর্চা কি স্থগিত?'

'বারে, সময় পাচ্ছি কই? সুকন্যার পরীক্ষা না? তুমি তো আর ওর কাছে গিয়ে বসবে না'

'ভাব উঠলে কন্যার সামনে বসেই কলম চালাতে পারো'

'কারো সামনে বসে আমার লেখা আসে না। ভাব বাণী না হয়ে গলে পানি হয়ে যায়।'।

সুকন্যা মায়ের কবিতা পড়ে। অবিকল মায়ের মতো দেখতে হয়েছে বলে মারুফ বলে সুকন্যাও চেষ্টা করলে মায়েরই মতো কবি হতে পারবে। সুকন্যা অবশ্য নিজেও এরই মধ্যে চারটে কবিতা লিখেছে। কিন্তু মাকে দেখায়নি। ওর লজ্জা করে। ওর নিজের কাছেই কেমন কাঁচা মনে হয়। মাকে বলে–

'মা তোমার এই কবিতাটা কাকে নিয়ে লেখা? বাবাকে? না অন্য কাউকে?'

'শোন্, কবিতা হচ্ছে একটা ভাবনার বিধিবদ্ধ শৈল্পিক প্রকাশ। সে ভাবনাটাকে দাঁড় করাতে একটা বিষয় বা একজন মানুষকে সামনে রাখলে তা আরও অকৃত্রিম হয়ে ওঠে। সবসময় সেই মানুষটি বা বিষয়টিই যে অবিকল ধরা দেবে কবিতায় তা নয়, বরং একটা অনুষঙ্গ হিসেবে চলে আসতে পারে। কাউকে নিয়ে নয় বরং কাউকে আমার চিত্রকল্পের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলে আমার সুবিধা হয়'

'এতো কঠিন করে বুঝালে বুঝতে পারি না। যাক এবার বইমেলায় তোমার বই আসছে তো? আমি কিন্তু স্টলে বসে তোমার বই বিক্রি করবো'

'প্রকাশকরা অনেকেই চেয়েছে। দেখি কী করা যায়।'

সুচরিতা মেয়ের প্রশ্নে একটু অস্বস্তিবোধ করছিল। মারুফও আগে মাঝে মধ্যে এরকম প্রশ্ন করতো। ইদানিং করে না। 'কবির স্বাধীনতা' বিষয়ে একদিন একটা সেমিনারে যোগদানের পর থেকে মারুফ আর ও নিয়ে প্রশ্ন করে না। তাছাড়া বয়স বাড়ার সাথে সাথে ইদানিং সুচরিতার কবিতার বিষয়বস্তুও পরিবর্তীত হচ্ছে। কবছর আগেও যেমন শুধুই প্রেম ছিল এখন একটু আধটু রাজনীতি, দেশ, সমাজ, ইতিহাস, নারীর বঞ্চনা ইত্যাদি সচেতনভাবেই কবিতায় এসে যাচ্ছে। বিভিন্ন কাব্য সংগঠন থেকে আমন্ত্রণ পেলেও সুচরিতা কোথাও যায় না। ও একটু প্রচারবিমুখ। একবার টিভির একটা চ্যানেল ওকে কবিতা পড়তে ডেকেছিল। ও যায়নি। মারুফ অবশ্য উৎসাহিত করে। আর ভক্তরা পত্রিকা অফিস থেকে ওর মোবাইল নম্বর জোগাড় করে এসএমএসে

কবিতার প্রশংসা করে। তবে গঠনমূলক সমালোচনা বেশি করে আনন্দ নামের ভক্তটি। আনন্দের কবিতাও ভালো। ওর কবিতাও সাময়িকীসহ ছোট কাগজে আসে। আজকাল এসএমএসে নিজের আবেগের কথাও লিখে দেয় আনন্দ। সুচরিতার খারাপ লাগে না। কিন্তু ঐ পড়া অব্দিই। নিজে ওসবের কোন প্রত্যুত্তর করে না। পড়েই মুচকি হেসে মুছে ফেলে। আবার একেকবার যে ভাবে না তা নয় যে–আনন্দের বয়স কত হতে পারে? যা পরিণত ওর হাত! সুচরিতার সমবয়সীও হতে পারে। কিন্তু বয়স, পরিবার, পরিজন, শিক্ষা বা সামাজিক অবস্থান নিয়ে ওদের মধ্যে কখনও এসএমএস বিনিময় হয় না। আর কথা তো হয়ই না। কবিতার বিষয় ছাপিয়ে অন্য প্রসংগ এসে গেলে সুচরিতা মোবাইল অফ করে দেয়। ছেলেমানুষীর বয়স সেই কবে ফেলে এসেছে! আনন্দের এসএমএস সুকন্যা দেখে ফেলেনি তো? না হলে মাকে ওরকম প্রশ্ন করতে গেল কেন?

'ধীমান প্রকাশনা' থেকে সুচরিতার কবিতার বই বেরোল। মারুফ সুচরিতাকে দুদিন জোর করে মেলায় নিয়ে গেল। প্রকাশক বলেছিলেন স্টলে এসে মাঝে মধ্যে বসতে। সুচরিতার ওসব ভাল্লাগে না। সুকন্যা ওর বন্ধুদের নিয়ে মেলায় যায়। একদিন প্রকাশক সুচরিতার মেয়েকে দেখে চেহারা আন্দাজ করেই স্টলে বসতে বলেন। সুকন্যা অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছিল কোকড়া চুলের কবি কবি চেহারার একজন সুদর্শন তরুণ বারবার ঘুরে ঘুরে 'ধীমান'-এর সামনে এসে ওর মায়ের বই খুলে দেখছে। বই-এর পেছনের ফ্ল্যাপে সুচরিতার ছবি দেখে সুকন্যার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বই কিনে নিয়ে চলে গেল। বইটিতে সুচরিতার যৌবনের ছবি।

এসএমএসের সংকেত পেয়ে সুচরিতা ইনবক্স ওপেন করলো

'shu, tumi tomar kobitar motoi shundor. kokra chuler je cheleti eimatro tomar shamne theke tomar boi kine chole gelo shei tomar ANANDO. plz kal melai amake ektu shomoy dio.'